সোনার ঘণ্টা

অনিল ভৌমিক

4014 692

4.4
692
~~661~~

সোনার ঘণ্টা

অনিল ভৌমিক

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
25/3, B.C. Road

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
কলিকাতা-৭০০০০৭

SONAR-GHANTA
by Anil Bhowmick
Rs 10·00

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market,
Calcutta, 700007 (1st floor)

প্রথম প্রকাশ
শুভ দীপাবলী, ১৩৮৬
নভেম্বর, ১৯৭৯

অষ্টম মুদ্রণ :
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৯৪
মে, ১৯৮৭

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা৭০০০০৭

মুদ্রাকর :
সন্তোষী প্রিন্টার্স
তাপস মিত্র
১৪৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদচিত্র :
নারায়ণ দেবনাথ

পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল

দশ টাকা

10.9.2010
14080

‘সোনার ঘণ্টা’ প্রসঙ্গে

ঘণ্টা সোনার কি রূপোর কি নেহাৎই তামার বা পিতলের, সেটা কোন বিচারের কথাই নয়। আসল যা হ’ল বিচার্য তা হচ্ছে ঘণ্টার ধ্বনি। সে ধ্বনি দিয়েই ঘণ্টার সত্যকার পরিচয়।

‘সোনার ঘণ্টা’ নামটির দরুণ যে কথাগুলি বলবার সুযোগ পেলাম শ্রীঅনিল ভৌমিকের সেই কিশোর উপন্যাসটি সম্বন্ধে সেগুলি বিশেষভাবে খাটে। বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য লেখা বই-এর সংখ্যা ইদানীং যথেষ্ট বাড়লেও সত্যিকার সার্থক লেখার দেখা খুব কমই মেলে। ‘সোনার ঘণ্টা’ তার মধ্যে একটি বিশেষভাবে সমাদর পাবার বই, একথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। গল্পের বিষয় ও বলবার মুন্সিয়ানা, সব দিক দিয়েই বইটি মনে রাখবার মত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'কসবা জগদীশ বিদ্যাপীঠ'-এর
প্রাক্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

একটি চিত্রকাহিনীই "সোনার ঘণ্টা" উপন্যাসটির মূল প্রেরণা। সেই কাহিনী ঢেলে সাজাতে গিয়ে ঘটনা, চরিত্র সবকিছু আমাকে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ—ইহুদী জ্যাকব, কাসেম, মকবুল, ফজল, হ্যারি প্রভৃতি চরিত্রগুলো আমারই চিন্তার ফসল। কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতিকুলতা পেরিয়ে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়া ও ফেরা, দু'টো মোহরে খোদিত নক্সার কাহিনী ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মতো ক'রে আমাকে সাজাতে হয়েছে। অনেকস্থলে চিত্রকাহিনীর ফাঁকও পূরণ করতে হয়েছে। এইভাবে বর্তমান উপন্যাসের পূর্ণরূপ গড়ে উঠেছে।

সবশেষে নিবেদন—উপন্যাসটি কিশোরদের জন্য রচিত। তাই কাহিনীর নায়ক ফ্রান্সিসকে নিছক এ্যাডভেঞ্চার বিলাসীরূপে অঙ্কন না ক'রে তাকে একটা জীবন-দর্শনের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি। কিশোরদের মনে এই দৃষ্টিভঙ্গীটুকু স্বীকৃতি পেলেই "সোনার ঘণ্টা" রচনা সার্থক ব'লে মনে করবো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—"সোনার ঘণ্টা" প্রথমে 'শুকতারা' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

দীপাবলী, ১৩৮৬

অনিল ভৌমিক

সোনার ঘণ্টা

অনেকদিন আগের কথা । শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে একটা নিঃসঙ্গ পালতোলা জাহাজ । যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল—সীমাহীন সমুদ্র ।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে পশ্চিমের আকাশটা যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে । জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়েছিল ফ্রান্সিস । সে কিন্তু পশ্চিমের আবির-ঝরা আকাশ দেখছিল না । সে ছিল নিজের চিন্তায় মগ্ন । ডেক-এ পায়চারি করতে-করতে মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল । ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল, কখনো আকাশের দিকে, কখনো সমুদ্রের দিকে । তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা—সোনার ঘণ্টার গল্প কি সত্যি, না সবটাই গুজব । নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘণ্টা—বিরাট ঘণ্টা—এই ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি কোন দ্বীপে নাকি আছে সেটা । কেউ বলে সেই সোনার ঘণ্টাটা নাকি জাহাজের মাস্তুলের সমান উঁচু, কেউ বলে সাত-আট মানুষ সমান উঁচু । যত বড়ই হোক—নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি একটা ঘণ্টা, সোজা কথা নয় ।

এই ঘণ্টাটা তৈরি করার ইতিহাসও বিচিত্র । স্পেন দেশের সমুদ্রের ধারে ভিমেলো নামে ছোট্ট একটা শহর । সেখানকার গীর্জায় থাকতো জনপঞ্চাশেক পাদ্রী । তারা দিনের বেলায় পাদ্রীর কাজকর্ম করতো । কিন্তু সন্ধ্যে হলেই পাদ্রীর পোশাক খুলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরে নিতো । তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুত । ডাকাতি, লুটপাট করতে । প্রতি রাত্রে দশ-পনেরোজন করে বেরুত । টাকা-পয়সা লুঠ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না । লক্ষ্য শুধু একটাই—সোনা সংগ্রহ করা । শুধু সোনাই লুঠ করত তারা ।

ধারে-কাছে শহরগুলোতে এমন কি দূর-দূর শহরেও তারা ডাকাতি করতে যেত । ভোর হবার আগেই ফিরে আসত ভিমেলোর গীর্জায় । গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গল । তার মধ্যে একটা ঘণ্টার ছাঁচ মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল । সোনার মোহর বা অলংকার যা কিছু ডাকাতি করে আনত, সব গলিয়ে সেই ঘণ্টার ছাঁচে ফেলে দিত । এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সোনা দিয়ে ছাঁচ ভরানো চলল ।

কিন্তু ঘণ্টা অর্ধেক তৈরি হবার পর কাজ বন্ধ হয়ে গেল । এত ডাকাতি হতে দেখে দেশের সব বড়লোকেরা সাবধান হয়ে গেল । তারা সোনা সরিয়ে ফেলতে লাগল । ডাকাতি করে সিন্দুক ভেঙে পাদ্রী ডাকাতরা পেতে লাগল শুধু রূপার মুদ্রা । মোহর বা সোনার অলংকারের নামগন্ধও নেই ।

কি করা যায় ? ডাকাত পাদ্রীরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসল । সোনার ঘণ্টাটা অর্ধেক হয়ে থাকবে ? তারা যখন ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না, তখন একজন পাদ্রী খবর নিয়ে এল—দেশের সব বড়লোকেরা বিদেশে সোনা সরিয়ে ফেলছে জাহাজে করে । ব্যাস । অমনি পাদ্রী ডাকাতরা ঠিক করে ফেলল; এবার জাহাজ লুঠ করতে হবে । যেমন কথা তেমনি কাজ । একটা জাহাজ কিনে ফেলল তারা । তারপর নিজেদের মধ্যে থেকে তিরিশজন বাছাই করা লোক নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে তারা সমুদ্রে জাহাজ ভাসাল । বাকি পাদ্রীরা গীর্জাতেই রইল । লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে তো ! ভিমেলো শহরের লোকেরা জানল—গীর্জার তিরিশজন পাদ্রী বিদেশে গেছে ধর্মপ্রচারের জন্যে ।

কারো মনেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দীর্ঘ তিন-চার মাস ধরে পাদ্রী ডাকাতরা সমুদ্রের বুকে ডাকাতি করে বেড়াল। স্পেনদেশ থেকে যত জাহাজ সোনা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিল, কোন জাহাজ রেহাই পেল না।

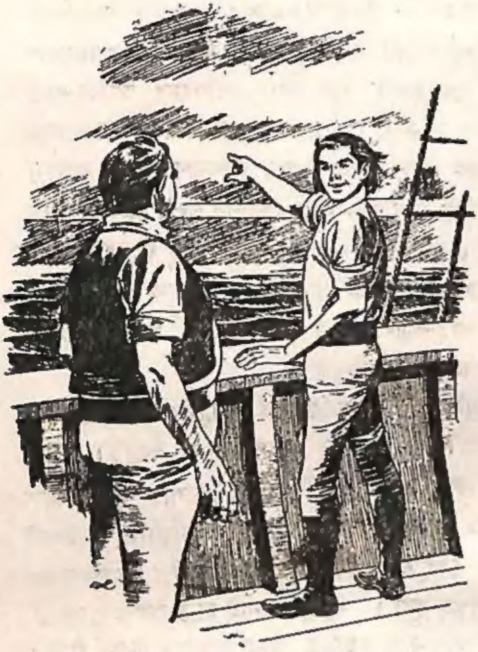

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

লুঠতরাজ শেষ করে ডাকাত পাদ্রীরা ভিমেলো শহরের গীর্জায় ফিরে এল। জাহাজ থেকে নামানো হল সোনাভর্তি বাক্স। দেখা গেল কুড়িটা কাঠের বাক্স ভর্তি অজস্র মোহর আর সোনার অলংকার। সবাই খুব খুশী হল। যাক্, এতদিনে ঘণ্টাটা পুরো তৈরী হবে।

ঘণ্টাটা সম্পূর্ণ তৈরী হল। কিন্তু মাটির ছাঁচটা ভেঙে ফেলল না। ছাঁচ ভেঙে ফেললেই তো সোনার ঘণ্টাটা বেরিয়ে আসবে। যদি সোনার ঝক্‌মকানি কারোর নজরে পড়ে যায়।

তারপরের ঘটনা সঠিক জানা যায় না। তবে ফ্রান্সিস বুড়ো নাবিকদের মুখে গল্প শুনেছে, ডাকাত পাদ্রীরা নাকি একটা মস্তবড় কাঠের পাঠাতনে সেই সোনার ঘণ্টা তুলে নিয়ে জাহাজের পেছনে বেঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। ভূমধ্যসাগরের ধারে কাছে এক নির্জন দ্বীপে তারা সোনার ঘণ্টাটা লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ডাকাত পাদ্রীদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একজনও বাঁচেনি। কাজেই সেই নির্জন দ্বীপের হদিস আজও সবার কাজে অজানাই থেকে গেছে।

—এই যে ভায়া!

ফ্রান্সিসের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ভুঁড়িওলা জ্যাকব কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ও বুঝতেই পারেনি। জ্যাকব হাসতে-হাসতে বলল—ভুরু কুঁচকে কি ভাবছিলে অত?

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

—ওখানে কি? জ্যাকব বোকাটে মুখে জিজ্ঞেস করল।

—ওখানে—আকাশে কত সোনা—অথচ সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। জ্যাকব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাজখাঁই গলায় হেসে বললো—"ফ্রান্সিস—তোমার নির্ঘাৎ ক্ষিদে পেয়েছে, খাবে চলো।"

খেতে বসে দু'জনে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস জাহাজের আর কোন নাবিকের সঙ্গে বেশী মিশত না। ওর ভালও লাগত না। কিন্তু এই ভুঁড়িওলা জ্যাকবের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ও জ্যাকবের কাছে মনের কথা খুলে বলত।

ফ্রান্সিস ছিল জাতিতে ভাইকিং। ইউরোপের পশ্চিম সমুদ্রতীরে ভাইকিংদের দেশ। ভাইকিংদের অবশ্য বদনাম ছিল 'জলদস্যু' জাত বলে। শৌর্যে-বীর্যে আর জাহাজ চালনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্যে ইউরোপের সব জাতিই তাদের সমীহ করত। ফ্রান্সিস কিন্তু সাধারণ ঘরের ছেলে না। ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে সে। কিন্তু এই ভিনদেশী জাহাজে যাচ্ছিল সাধারণ নাবিকদের কাজ নিয়ে—নিজের পরিচয় গোপন করে। এটা জানত শুধু ভুঁড়িওলা জ্যাকব।

মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে-চিবুতে জ্যাকব ডাকল—ফ্রান্সিস ?

—হুঁ—

—তুমি বাপু দেশে ফিরে যাও।

—কেন ?

—আমাদের এই দাঁড়বাওয়া, ডেক-মোছা—এসব কম্মো তোমার জন্যে নয়।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—তোমার কথাটা মিথ্যে নয়। এত পরিশ্রমের কাজ আমি জীবনে করিনি। কিন্তু জানো তো—আমার ভাইকিং—যে কোনরকম কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের জন্মগত। তা ছাড়া—

—কি ?

—ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি সেই সোনার ঘণ্টার গল্প—

—ও। সেই ডাকাত পাদ্রীদের সোনার ঘণ্টা ? আরে ভাই ওটা গাঁজাখুরী গপ্পো।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

—তবে ?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভূমধ্যসাগরের ধারে-কাছে—কোন দ্বীপে নিশ্চয়ই সেই সোনার ঘণ্টা আছে।

—পাগল। জ্যাকব খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বললো—জানো—দেশ ছাড়বার আগে—একজন বুড়ো নাবিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বুড়োটা বলত—ও নাকি সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনেছে।

—এ্যাঁ, বলো কি ! জ্যাকব অবাক চোখে তাকাল।

—লোকে অবশ্য বুড়ো নাবিকটাকে পাগল বলে ক্ষেপাত। আমি কিন্তু মন দিয়ে ওর গল্প শুনেছিলাম।

—কি গল্প ?

—ভূমধ্যসাগর দিয়ে নাকি ওদের জাহাজ আসছিল একবার। সেই সময় এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওরা দিক ভুল করে ফেলে। তারপর ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ওদের জাহাজ ডুবে যায়। ডুবন্ত জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ও একটা ঘণ্টার শব্দ শুনেছিল—ঢং—ঢং। ঝড়জলের শব্দ ছাপিয়ে বেজেই চলেছিল—ঢং—ঢং।

জ্যাকবের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁ করে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করলে—সোনার ঘণ্টার শব্দ ?

—নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ভুঁড়িওয়ালা জ্যাকবের মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না।

* * *

পরের দু'দিন জাহাজের নাবিকদের বেশ আনন্দেই কাটলো। পরিস্কার ঝকঝকে আকাশ। জোর বাতাস। জাহাজের পালগুলো হাওয়ার তোড়ে বেলুনের মত ফুলে উঠল। জাহাজ চলল তীরবেগে। দাঁড়টানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নাবিকরা এই দু'দিন রেহাই পেল। কিন্তু জাহাজের ডেক পরিস্কার করা, জাহাজের মালিকের ফাই-ফরমাস খাটা, এসব করতে হল। তবু নাবিকেরা সময় পেল—তাস খেলল, ছক্কা-পাঞ্জা খেলল, আড্ডা দিল, গল্পগুজব করল অনেক রাত পর্যন্ত।

ফ্রান্সিস যতক্ষণ সময় পেয়েছে হয় ডেক-এ পায়চারি করেছে, নয়তো নিজের বিছানায় শুয়ে থেকেছে। ভুঁড়িওলা জ্যাকব মাঝে-মাঝে ওর খোঁজ করে গেছে। শরীর ভালো আছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছে। একটু খোশগল্পও করতে চেয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের তরফ থেকে কোন উৎসাহ পেয়ে অন্য নাবিকের আড্ডায় গিয়ে গল্প জুড়েছে। ফ্রান্সিসের একা থাকতে ভালো লাগছিল, নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতে। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছে ও। কবে ফিরবে অথবা কোনদিন ফিরবে কি না কে জানে। মাথায় ওর মাত্র একটাই সংকল্প, যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে সোনার ঘণ্টার হদিস।

সোনার ঘণ্টার কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, ফ্রান্সিস জানে না। হঠাৎ নাবিকদের দৌড়াদৌড়ি উচ্চ কণ্ঠে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হল কি? এদের এত উত্তেজনার কারণ কি? এমন সময় জ্যাকব ছুটতে-ছুটতে ফ্রান্সিসের কাছে এল।

—সাংঘাতিক কাণ্ড। জ্যাকব তখনও হাঁপাচ্ছে।

—কি হয়েছে?

—ওপরে—ডেক-এ চল—দেখবে'খন।

দ্রুতপায়ে ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপরে উঠে এল। জাহাজের সবাই ডেক-এর ওপর এসে জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের চারপাশে সমুদ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল তখন। আর বেলাও হয়েছে। অথচ চারদিকে কুয়াশার ঘন আস্তরণ। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। চারিদিকে কেমন একটা মেটে কালো। এক ফোঁটা বাতাস নেই। জাহাজটা স্থাণুর দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। এই অসময়ের কুয়াশা? কোন এক অমঙ্গলের চিহ্ন নয় তো?

জাহাজের মালিক সর্দার-নাবিককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। বোধহয় কি করবে এখন তারই শলা-পরামর্শ করতে। সবাই বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ফ্রান্সিস খুশীতে শিস্ দিয়ে উঠল। আশ্চর্য! শিসের শব্দ অনেকের কানেই পৌঁছল। এই বিপত্তির সময় কোন্ বেআক্কেলে শিস দেয় রে? তারা ফ্রান্সিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল—ফ্রান্সিসের মুখে মৃদু হাসি। এবার ওদের আরো অবাক হবার পালা। ফ্রান্সিসকে ওরা কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। সব সময় গোমড়া মুখে ভুরু

কুঁচকে থাকতেই দেখেছে। মাথায় যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা। এই লোকটা হাসছে? অবাক কাণ্ড!

ফ্রান্সিসের এই খুশীতে অর্থাৎ শিস্ দিয়ে ওঠাটা কেউই ভালো চোখে দেখল। তবে সবাই মনে-মনে গরজাতে লাগল। জ্যাকব গম্ভীর মুখে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

—কেন?

—সবাই ভয়ে মরছি, আর তুমি কিনা শিস্ দিচ্ছো?

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। জ্যাকব মুখ বেঁকিয়ে বলল, তোমরা ভাইকিং—খুব সাহসী তোমরা, কিন্তু তাই বলে তোমার কি মৃত্যু ভয়ও নেই?

—আছে বৈ-কি! তবে আমার খুশী হবার অন্য কারণ আছে।

—বলো কি?

—হ্যাঁ? ফ্রান্সিস জ্যাকবের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা খুশীর স্বরে বলতে লাগল—জানো সেই বুড়ো পাগলা নাবিকটা বলছিল—ওদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়বার আগে; ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে—এমনি ঘন কুয়াশার মধ্যে আটকে গিয়েছিল—ঠিক এমনি অবস্থা—বাতাস নেই, কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার—

ফ্রান্সিস আর জ্যাকব ডেক-এর কোণায় দাঁড়িয়ে যখন কথা বলেছিল, তখন লক্ষ্য করেনি যে, ডেক-এর আর এর কোণে নাবিকদের একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছে। ওরা ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। দু'-একজন চোখের ঈশারায় জ্যাকবকে দেখল। ব্যাপারটা সুবিধে নয়। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। জ্যাকব সজাগ হল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। ও উল্‌টোদিকে মুখ ফিরিয়ে সামনের সাদাটে কুয়াশার আস্তরণের দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তায় বিভোর।

নাবিকদের জটলা থেকে তিন-চারজন ষণ্ডাগোছের নাবিক ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জ্যাকব ওদের মুখ দেখেই বুঝলো, কিছু একটা কুমতলব আছে ওদের। ফ্রান্সিসকে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিল। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকাল। জ্যাকব চোখের ঈশারায় ষণ্ডাগোছের লোকগুলোকে দেখল। তাদের পেছনে-পেছনে আর সব নাবিকেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল, কিছু একটা মতবল নিয়েই ওরা এদিকে আসছে। ও কিন্তু এই থমথমে আবহাওয়াটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে গলা চড়িয়ে বলল—ব্যাপার কি? অ্যাঁ—এখানে নাচের আসর বসবে নাকি? কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। ষণ্ডাগোছের লোক ক'জন ওদের দু'জনের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে এসে দাঁড়াল। দলের মধ্যে থেকে ইয়া দশাসই চেহারার একজন গম্ভীর গলায় ডাকল—এই জ্যাকব, শোন এদিকে।

ফ্রান্সিস তখন হেসে বলল—যা বলবার বাপু ওখান থেকেই বলো না।

সেই নাবিকটা এবার আঙ্গুল দিয়ে জ্যাকবকে দেখিয়ে পেছনের নাবিকদের তাকিয়ে—এই জ্যাকব ব্যাটা ইহুদী। এই বিধর্মীটা যতক্ষণ জাহাজে থাকবে—ততক্ষণ কুয়াশা কাটবে না—বিপদ আরো বাড়বে! তোমরাই বলো ভাই—এই অলুক্ষুণেটাকে কি করবো?

হই-হই চীৎকার উঠল নাবিকদের মধ্যে।

কেউ-কেউ তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে বলল—জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—খুন কর বিধর্মীটাকে।

—ফাঁসীতে লটকাও।

ভয়ে জ্যাকবের মুখ সাদা হয়ে গেল। কিছু বলবার জন্য ওর ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠল। দশাসই চেহারার নাবিকটা জ্যাকবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই ফ্রান্সিস জ্যাকবকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের তখন অন্য চেহারা। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটা ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ জ্বলজ্বল করছে। দাঁতচাপা স্বরে ফ্রান্সিস বলল—জ্যাকব আমার বন্ধু। যে গায়ে হাত দেবে, তার হাত আমি ভেঙে দেব।

একমুহূর্তে গোলমাল হই-চই থেমে গেল। ষণ্ডা ক'জন থমকে দাড়াল। কে যেন চীৎকার করে উঠল—দু'টোকেই জলে ছুঁড়ে দাও।

আবার চিৎকার, মার-মার রব উঠল। ফ্রান্সিস আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল; ডেক-এর কোণার দিকে একটা ভাঙা দাঁড়ের হাতলের অংশটা পড়ে আছে। চোখের নিমেষে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল। চেঁচিয়ে বলল—মরদ হো তো এক-একজন করে আয়।

দশাসই চেহারার লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে একপাশে সরে গিয়ে ফ্রান্সিসের হাতের ভাঙা দাঁড়টা চালল ওর মাথা লক্ষ্য করে। লোকটার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরল শুধু—'অ-ক'। তারপরই ডেকের ওপর সে মুখ থুবড়ে পড়ল। মাথাটা দু'-হাতে চেপে কাতরাতে লাগল। ওর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই থমকে দাড়াল। কিন্তু একমুহূর্ত। তারপরেই আর একটা ষণ্ডাগোছের লোক ঘুষি বাগিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস তৈরী হয়েই ছিল। ভাঙা দাঁড়টা সোজা লোকটার থুত্‌নি লক্ষ্য করে চালাল। লোকটা বেমক্কা মার খেয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে ডেক-এর পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। দাঁত ভাঙল কয়েকটা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। মুখ চেপে ধরে লোকটা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস উত্তেজিত জনতার নাবিকদের জটলার দিকে চোখ রেখে চাপাস্বরে ডাকল—'জ্যাকব'।

জ্যাকব এতক্ষণে সাহস ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে ফ্রান্সিসের মত রুখে না দাঁড়াতে পারলে মরতে হবে। জ্যাকব চাপাস্বরে উত্তর দিল—কী ?

—ঐ যে ডেকঘরে দেয়ালে সর্দারের বেল্টসুদ্ধ তরোয়ালটা ঝোলানো রয়েছে—ঐ দেখছো ?

—হ্যাঁ।

—এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো। ভয় নেই—একবার তরোয়ালটা হাতে পেলে সব'কটাকে আমি একাই নিকেশ করতে পারবো—জলদি ছোট—

জ্যাকব পড়ি কি মরি করে ছুটল ডেক-ঘরের দেয়ালের দিকে। নাবিকদের দল কিছু বোঝাবার আগেই ও দেওয়ালে ঝোলানো তারোয়ালটা খপ করে খুলে নিল। এতক্ষণে নাবিকের দল ব্যাপারটা বুঝতে পারল, সবাই হই-হই করে ছুটল জ্যাকবকে ধরতে। জ্যাকব ততক্ষণে তরোয়ালটা ছুঁড়ে দিয়েছে ফ্রান্সিসের দিকে। তরোয়ালটা ঝনাৎ করে এসে পড়ল

ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে। তরোয়ালটা তুলে নিয়েই ছুটল ভিড়ের দিকে। ততক্ষণে ক্রুদ্ধ নাবিকের দল জ্যাকবকে ঘিরে ধরেছে। কয়েকজন মিলে জ্যাকবকে ধরে ডেক-ঘরের কাঠের দেয়ালে ওর মথা ঠুকিয়ে দিতে শুরু করেছে। কিন্তু খোলা তরোয়াল ফ্রান্সিসকে ছুটে আসতে দেখে ওরা জ্যাকবকে ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে সরে গেল। ফ্রান্সিস সেই নাবিকদলের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গলা জড়িয়ে বলল—জ্যাকব বিধর্মী হোক, আর যাই হোক—ও আমার বন্ধু। যদি তোদের মায়া থাকে; জ্যাকবের গায়ে হাত দিবি না।

ফ্রান্সিসের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে সবাই বেশ ঘাবড়ে গেল! ওরা জানতো—ফ্রান্সিস জাতিতে ভাইকিং। তরোয়াল হাতে থাকলে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। ডেক-এর ওপরে এত হইচই চীৎকার-ছুটোছুটির শব্দে মালিক আর নাবিক-সর্দার ছুটে ওপরে উঠে এল। ওরা ভাবতেই পারেনি, যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। এদিকে দু'জন ডেক-এর ওপর রক্তাক্ত দেহে কাতরাচ্ছে—ওদিকে ফ্রান্সিস খোলা তরোয়াল হাতে রুদ্রগতিতে দাঁড়িয়ে।

জাহাজের মালিক আশ্চর্য হয়ে গেল। সে দু'হাত তুলে চীৎকার করে বলল—শোন সবাই—মারামারি করবার সময় পরে অনেক পাবে, এখন যে বিপদে পড়েছি, তা থেকে উদ্ধারের কথা ভাবো।

এতক্ষণের উত্তেজনা মারামারির মধ্যে সবাই বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন আবার সবাই ভয়-ভয় চোখে চারদিকের ঘন কুয়াশায় দিকে তাকাতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই। এমন সময় ষণ্ডাগোছের নাবিকদের মধ্যে একজন চীৎকার করে বলল—এই যে জ্যাকব—ও ইহুদী—ওর জন্যই আমাদের এই বিপদ।

আবার গোলমাল শুরু হল। মালিক দু'হাত তুলে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করতে গেল। গোলমাল কমলে বলল—এটা বাপু জাহাজ—গীর্জে নয়! কার কি ধম্মো, তাই দিয়ে আমার কি দরকার। আমি চাই কাজের লোক। জ্যাকব তো কাজকর্ম ভালোই করে।

আবার চীৎকার শুরু হল—আমরা ওসব শুনতে চাইনা।

—জ্যাকবকে জাহাজ থেকে ফেলে দাও।

—মাস্তুলে ফাঁসি লটকাও।

জাহাজের মালিক ব্যবসায়ী মানুষ। সে কেন একটা লোকের জন্যে ঝামেলা পোহাবে। সে বলল—বেশ তোমরা যা চাইছে, তাই হবে।

ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলে উঠল—আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

জাহাজের মালিক পড়ল মহাফাঁপরে! তবে সে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী খুনোখুনি-রক্তপাত—এসবে বড় ভয়। বলল—ঠিক আছে—আর একটা দিন সময় দাও তোমরা। দাঁড়ে হাত লাগাও—জাহাজ চলুক—দেখা যাক—যদি একদিনের মধ্যেও কুয়াশা না; কাটে তা'হলে জ্যাকবকে ছুঁড়ে ফেলে দিও।

নাবিকের মধ্যে গুঞ্জন চলল। একটু পরে সেই ষণ্ডাগোছের নাবিকটা বলল, ঠিক আছে—আমরা আপনাকে একদিন সময় দিলাম।

—তা'লে আর দেরি করো না সবাই, যে যার কাজে লেগে পড়ো। মালিক নাবিক-সর্দারের দিকে ইশারা করল। সর্দার ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস একবার সেই নাবিকদের জটলার দিকে তাকাল। তারপর তরোয়ালটা সর্দারের হাতে দিল। চাপাস্বরে জ্যাকবকে বলল—ভয় নেই। দেখো—একদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যাবে।

নাবিকদের জটলা ভেঙে গেল। যে যার কাজে লেগে পড়ল। একদল পাল সামলাতে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসদের দল সর্দারের নির্দেশে সবাই জাহাজের খোলে নেমে এল। সেখানে দু'ধারে সার-সার বেঞ্চির মত কাঠের পাটাতন পাতা। সামনে একটা লম্বা দাঁড়ের হাতল। বেঞ্চিতে বসে ওরা পঞ্চাশজন দাঁড়ে হাত লাগাল তারপর সর্দারের ইঙ্গিতে একসঙ্গে পঞ্চাশটা দাঁড় পড়ল জলে—ঝপ্-ঝপ্। জাহাজটা নড়েচড়ে চলতে শুরু করল। ফ্রান্সিসের ঠিক সামনেই বসেছিল জ্যাকব। দাঁড় টানতে টানতে ফ্রান্সিস ডাকল—জ্যাকব?

—হুঁ।

—যদি সেই বুড়ো নাবিকটার কথা সত্যি হয় তাহলে—

—তাহলে কি?

—তাহলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝড়ের মুখে পড়ব।

—তারপর।

—ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা লেগে—

—জলের তলায় অক্কা পাবে—

—তার আগে সোনার ঘণ্টার বাজনা তো শুনতে পাবো।

জ্যাকব এবার মুখ ফিরিয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল—

পাগল! জাহাজ চলল। ছপ্—ছপ্। পঞ্চাশটা দাঁড়ের শব্দ উঠছে। চারিদিকে জমে থাকা কুয়াশায় মধ্য দিয়ে জাহাজ চলছে। কেমন একটা গুমোট গরম। দাঁড়িদের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। একফোঁটা হাওয়ার জন্যে সবাই হা-হুতাশ করছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ে হাওয়ার ঝাপটায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, তার ঠিক নেই। পরক্ষণেই প্রবল বৃষ্টিধারা আর হাওয়ার উন্মত্তবেগ। তালগাছ সমান উঁচু-উঁচু ঢেউ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজটা কলার মোচার মত ঢেউয়ের আঘাতে দুলতে লাগল। এই একবার জাহাজটা ঢেউ-এর গভীর ফাটলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে; আবার পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধাক্কায় উঠে আসছে ঢেউয়ের মাথায়।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে সামলে নিয়েছিল খুব। কারণ ও তৈরীই ছিল—ঝড় আসবেই। আর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে কাঠের পাটাতন ধরে-ধরে অনেকেই নিজের জায়গায় ফিরে এল। এল না শুধু জ্যাকব। কিছুক্ষণ আগে যে ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের কোণায় জোর ধাক্কা খেয়ে ও অজ্ঞানের মত পড়েছিল একপাশে। ফ্রান্সিস কয়েকবার জ্যাকবকে ডাকল। ঝড়ের গোঁ-গোঁয়ানি মধ্যে সেই ডাক জ্যাকবের কানে পৌঁছল না। ফ্রান্সিস দাঁড় ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে জ্যাকবকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় জ্যাকব? আর খোঁজা সম্ভব নয়।

প্রচণ্ড দুলুনের মধ্যে টাল সামলাতে না পেরে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ফ্রান্সিস।

হঠাৎ শক্ত কিছুতে ধাক্কা লেগে জাহাজের তলাটা মড়মড় করে উঠল। দাঁড়গুলো প্যাকাটির মত মটমট করে ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—ডুবোপাহাড়। আর এক মুহূর্তে দেরি না ফ্রান্সিস বহু কষ্টে টলতে-টলতে ডেক-এর ওপর উঠে এল। দেখল, ঝোড়ো হাওয়ার আঘাতে বিরাট ঢেউ ডেক-এর ওপর আছড়ে পড়ছে। আর সে কি দুলুনি! ঠিক তখনই সমস্ত জল-ঝড়-বৃষ্টির ছাপিয়ে শুনতে পেল ঘণ্টার শব্দ—ঢং-ঢং-ঢং। ঘণ্টা বেজেই চলল। সোনার ঘণ্টার শব্দ।

ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ঠিক তখনই মড়মড় শব্দে জাহাজের তলাটা ভেঙে গেল, আর সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে প্রবল-বেগে জল ঢুকতে লাগল। মুহূর্তে জাহাজের খোলাটা ভরে গেল। জাহাজটা পেছন দিকে কাৎ হয়ে ডুবতে লাগল। সশব্দে মাস্তুলটা ভেঙ্গে পড়ল। জাহাজের রেলিঙের কোণায় লেগে মাস্তুলটা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। উত্তাল সমুদ্রের বুকে মাস্তুলের যে টুকরোটা পড়ল, সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে কোনোরকমে ভাঙা মাস্তুলটা জড়িয়ে ধরল। বহুকষ্টে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা দিয়ে নিজের শরীরটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে নিল। ওদিকে ঘণ্টার শব্দ ফ্রান্সিসের কানে এসে তখন বাজছে ঢং-ঢং-ঢং।

* * *

ভোর হয়-হয়। পূর্বদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় আকাশটায় লালচে রঙ ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সাদা-সাদা সমুদ্রের পাখীগুলো উড়ছে আকাশে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁষে ফ্রান্সিস পড়ে আছে। মড়ার মতো। কোন সাড়া নেই। ঢেউগুলো বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর গা পর্যন্ত চলে আসছে।

সমুদ্র-পাখীর ডাক ফ্রান্সিসের কানে গেল। অনেক দূরে পাখীগুলো ডাকছে। আস্তে-আস্তে পাখীর ডাক স্পষ্ট হল। চেতনা ফিরে পেল ফ্রান্সিস। বেশ কষ্ট করেই চোখ খুলতে হল ওকে। চোখের পাতার নুনের সাদাটে আস্তরণ পড়ে গেছে। মাথার ওপরে আকাশটা দেখল ও। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে আড়ষ্ট ঘাড়টা ফেরাল। দেখলো সূর্য উঠতে। মস্তবড় থালার মতো টকটকে লাল সূর্য। আস্তে-আস্তে সূর্যটা ঢেউয়ের গা লাগিয়ে উঠতে লাগল। সবটা উঠল না বড় বিন্দু মত একটা অংশ লেগে রইল জলের সঙ্গে। তারপর টুপ করে উঠে ওপরের লাল থালাটার সঙ্গে মিশে গেল। সমুদ্রে এই সূর্য ওঠার দৃশ্য ফ্রান্সিসের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজকে এটা নতুন বলে মনে হল। বড় ভাল লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসছে ও।

ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলল—আরঃ কি সুন্দর এই পৃথিবী।

বেশ কষ্ট করে শরীরটা টেনে তুলল ফ্রান্সিস। হাতে ভর রেখে একবার চারদিকে তাকাল। ভরসা—যদি জাহাজের আর কেউ ওর মত ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে উঠে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে যতদূর চোখ যায় ও কাউকেই দেখতে পেল না। ওদের জাহাজের কেউ বোধহয় বাঁচেনি। জ্যাকবের কথা মনে পড়ল। মনটা ওর বড় খারাপ হয়ে গেল। গা থেকে বালি ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হাঁটুদুটো কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। তবু

উপায় নেই। চলতে হবে। লোকালয় খুঁজতে হবে। খাদ্য চাই, কিন্তু কোন্‌দিকে মানুষের বসতি ?

সূর্যের আলো প্রখর হতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস মুখে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে চারদিক দেখতে লাগল, একদিকে শান্ত সমুদ্র। অন্যদিকে শুধু বালি আর বালি। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এ কোথায় এলাম ? আর ভেবে কি হবে ! ফ্রান্সিস পা টেনে সেই ধু-ধু বালির মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।

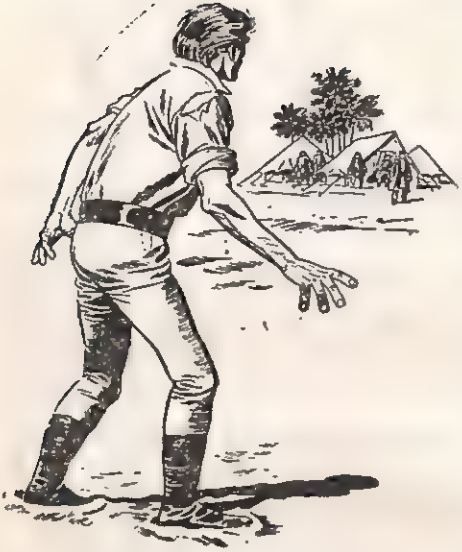

কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি।

মাথার ওপর সূর্য উঠে এল। কি প্রচণ্ড তেজ সূর্যের আলোর। তৃষ্ণায় জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে, হু-হু হাওয়া বইছে বালি উড়ছে। শরীর আর চলছে না। মাথা ঘুরছে। মাথার ওপর আগুন-ঝরানো সূর্য। বালির দিগন্তে দুলে-দুলে উঠছে। শরীর টলছে। তবু হাঁটতেই হবে। একবার থেমে পড়লে, বালির মুখ গুঁজে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। জোরে শ্বাস নিল ফ্রান্সিস। অসম্ভব ! থামা চলবে না।

একি ? মরীচিকা নয় তো ? ফ্রান্সিস হাত দিয়ে চোখদুটো ঘষে নিল। নাঃ। ঐ তো সবুজের ইশারা। কয়েকটা খেজুর গাছ। হাওয়ায় পাতাগুলো নড়ছে। কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি, খেজুর গাছে বাঁধা অনেকগুলো ঘোড়া, একটা ছোট্ট জলাশয়। একটা লোক ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি খাওয়াবার তদারকি করছিল। সেই প্রথম ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল। লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর তীক্ষ্নস্বরে কি একটা কথা বলে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুগুলো থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। তাদের গায়ে আরবীদের পোশাক। ঢোলা জোব্বা পরনে। মাথায় বিড়েবাঁধা সাদা কাপড়—কান পর্যন্ত ঢাকা। ফ্রান্সিসের বুকে আর দম নেই। মুখ দিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস শুধু দেখতে পেল লোকগুলোর মধ্যে কারো কারো হাতে খোলা তরোয়াল রোদ্দুরে ঝিকিয়ে উঠছে। আর কিছু দেখতে পেল না ফ্রান্সিস। সব কেমন আবছা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে পড়ল বালির ওপর। অনেক লোকের কণ্ঠস্বর কানে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে-করতে এদিকেই আসছে। তারপর আর কোন শব্দই ফ্রান্সিসের কানে গেল।

* * *

ফ্রান্সিস যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়েছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল, এটা তাঁবু। আস্তে-আস্তে ওর সব কথা মনে পড়ল। চারিদিকে তাকাল। এককোণে মৃদু আলো জ্বলছে। একটা বিছানার মত নরম কিছুর ওপর ও শুয়ে আছে। শরীরটা এখন অনেক ভাল লাগছে। ওপাশে কে যেন মৃদুস্বরে কথা বলছে। ফ্রান্সিস পাশ ফিরল।

লোকটা তাড়াতাড়ি এসে ওর মুখের ওপর বুকে পড়ল। লোকটার মুখে দাড়ি-গোঁফ। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। হয়তো তরোয়ালের কোপের। লোকটা হাসল—'কি? এখন ভাল লাগছে?'

মৃদু হেসে ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ।

লোকটা দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল—এই লোকটাই তার সেবাশ্রুষার ভার নিয়েছে।

পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ফ্রান্সিস প্রায় সমস্তক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। কপাল-কাটা লোকটাই তার দেখাশুনো করল। ফ্রান্সিস এ লোকটার কাছ থেকে শুধু এইটুকুই জানতে পারল, যে এরা একদল বেদুইন ব্যবসায়ী। এখানথেকে কিছুদূরেই আমদাদ শহর। এখানকার সুলতানের রাজধানী। ওখানেই যাবে এরা। সারাদিনে এদের দলপতি বারদুয়েক ফ্রান্সিসকে দেখে গেছে। দলপতির দীর্ঘ দেহ, পরনে আরবীয় পোশাক, কোমরে সোনার কাজকরা খাপে লম্বা তরোয়াল। দলপতি বেশ হেসেই কথা বলছিল ফ্রান্সিসের সঙ্গে। ফ্রান্সিসকে তার যে বেশ পছন্দ হয়েছে, এটা বোঝা গেল। দলপতির সঙ্গে সবসময়ই একটা লোককে দেখেছিল ফ্রান্সিস। মুখে বসন্তের দাগ। কেমন এবড়ো-খেবড়ো কঠিন মুখ। ধূর্ত চোখের দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারিদিক। ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটা খেজুর গাছের নীচে এসে বসল। জলাশয়ের ওপরে একজন বেদুইন একটা তেড়াবাঁকা তারের যন্ত্র বাজিয়ে নাকিসুরে গান করছে। ফ্রান্সিস চুপ করে বসে গান শুনতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল দূরে ছায়া-ছায়া বালি-প্রান্তর দিয়ে কে যেন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লোকটা এল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমেই সোজা দলপতির তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই দলপতির তাঁবু থেকে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কয়েকজন ঢুকল। বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব। কি খবর নিয়ে এল লোকটা? ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হল, ওর পাশেই কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। আরে? সেই কপাল-কাটা লোকটা ওর জন্যে অনেক করেছে অথচ নাম জানা হয়নি।

—আরে বসো-বসো। ফ্রান্সিস সরে বসবার জায়গা করে দিল। লোকটাও বসল।

—কি কাণ্ড দেখ—তোমার নামটাই জানা হয় নি।

—ফজল আলি, সবাই ফজল বলেই ডাকে—লোকটা আস্তে-আস্তে বলল।

এবার কি জিজ্ঞেস করবে ফ্রান্সিস ভেবে পেল না।

ফজলই কথা বলল—তুমি আমার কপালের দাগটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

ফ্রান্সিস একটু অপ্রস্তুত হল। বলল—তা ওরকম দাগ তো বড় একটা দেখা যায় না।

—আমার ভাই তরোয়াল চালিয়েছিল; এটা তারই দাগ।

—সে কি!

—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

—সেইদিন থেকে তরোয়াল একটা রাখতে হয় তাই রাখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা খাপ থেকে বের করিনি। যাক্‌গে—ফজল একটু থেমে বলল—তুমি তো ভাই এখানকার লোক নও।

—ঠিক ধরেছো—আমি ভাইকিং।

—ভাইকিং! বাপস্‌রে, তোমাদের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি।

—তাই নাকি? ফ্রান্সিস হাসল।

—তোমার নাম?

—ফ্রান্সিস।

—কোথায় যাচ্ছিলে?

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। সোনার ঘণ্টার খোঁজে যাচ্ছিলাম, এ সব বলা বিপজ্জনক। তা ছাড়া ও সব বললে পাগলও ঠাহরে নিতে পারে। বলল—এই—ব্যবসার ফিকিরে—

—জাহাজডুবি হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

দু'জনের কেউ আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস একবার আকাশের দিকে তাকাল। পরিষ্কার আকাশ। আকাশ জুড়ে তারা। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। হঠাৎ ফজল চাপাস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস?

—কি?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দল ছেড়ে পালাও।

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বললো—কেন?

ফজল চারিদিক তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—এটা হচ্ছে বেদুইন মরুদস্যুদের দল।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—তুমিও তো এই দলেরই।

—উপায় নেই ভাই—একবার এই দস্যুদলে ঢুকলে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ।

—কেন?

—এই তল্লাটের সব শহরে, বাজারে, মরূদ্যানে এদের চর রয়েছে। তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। তারপর—

—মানে—খুন করবে?

—বুঝতেই পারছো।

—কিন্তু—ফ্রান্সিসের সংশয় যেতে চায় না। বলল—সর্দারকে তো ভালো লোক বলেই মনে হল।

—তা ঠিক কিন্তু সর্দারকে চালায় এই কাসেম—কাসেমকে দেখেছো তো।

—হ্যাঁ—বীভৎস দেখতে।

—যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। ওর মত সাংঘাতিক মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

—হুঁ। কাসেমকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।

—কালকেই দেখতে পাবে, কাসেমের নিষ্ঠুরতার নমুনা।

—তার মানে ?

আজকে শেষ রাত্তিরে আমরা বেরুবো। গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে এইমাত্র—মস্তবড় একটা ক্যারাভান (মরুপথের যাত্রীদল) এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে যাবে।

—ক্যারাভ্যান ?

—হ্যাঁ। ব্যবসায়ীদের ক্যারাভ্যান। দামী-দামী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মোহর, সোনার গয়নাগাঁটি এসব তো রয়েইছে। ক্যারাভ্যানে তো শুধু ব্যবসায়ীরাই যায় না—অন্য লোকেরাও যায় তাদের পরিবারের লোকজন নিয়ে। দল বেঁধে গেলে ভয় কম।

—তোমরা ক্যারাভ্যান লুঠ করবে ?

—সর্দারের হুকুম। কথাটা বলেই ফজল গলা চড়িয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করল—'শুনেছি তোমাদের দেশে নাকি বরফ পড়ে—আমরা বরফ কোনদিন চোখেও দেখিনি।' ফ্রান্সিস কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। তবে অনুমান করলো ফজল কাউকে দেখেই অন্য কথা বলতে শুরু করেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল খেজুর গাছের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। কাসেম ! কাসেম গম্ভীর গলায় বলল—ফজল, শেষ রাত্তিরে বেরুতে হবে—ঘুমিয়ে নাও গে যাও।

—হ্যাঁ এই যাচ্ছি। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। চলে যেতে-যেতে গলা চড়িয়ে বলল—তা'হলে এ কথাই রইল—তুমি ওখান থেকে বরফ চালান দেবে, বদলে আমি এখান থেকে বালি চালান দেবো।

কাসেম এবার কুৎসিত মুখে হাসলো—এই সাদা ভিনদেশী—তুইও যাবি সঙ্গে।

ফ্রান্সিসের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কথা বলার কি ভঙ্গী! কিন্তু ও চুপ করে রইল। শরীর দুর্বল। এখন আশ্রয়ের খুবই প্রয়োজন। চটাচটি করলে নিজেরই ক্ষতি। সময় আসুক। অপমানের শোধ তুলবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। পেছনে শুনল কাসেমের বীভৎস হাসি—'ওঃ শাহাজাদার গোঁসা হয়েছে—হা—হা।'

* * *

মরুদস্যুর দল ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। শেষ রাত্রির আকাশটা কেমন ঘোলাটে। তারাগুলো অস্পষ্ট। একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। ফ্রান্সিস উটের লোমের কম্বল কান অব্দি তুলে দিল। কোমরে নতুন তরোয়ালটার খাপটায় হাত দিল একবার।

বালিতে ঘোড়ার ক্ষুরের অস্পষ্ট শব্দ। ঘোড়ার শ্বাস ফেলার শব্দ। মাঝে-মাঝে ঘোড়ার ডাক। মরুদস্যুর দল ছুটে চলেছে। কাসেমের চীৎকার শোনা গেল—আরো জোরে। ফ্রান্সিস ঘোড়ার রাশ অনেকটা আলগা করে দিল। ঘোড়ার পেটে পা ঠুকলো। সকলেই ঘোড়ার চলা গতি বাড়িয়ে দিল।

পূবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই লাল টকটকে সূর্য উঠল। তারপর নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল ধুধু বালির প্রান্তরে। সেই আলোয় হঠাৎ দূরে গেল—একটা আঁকাবাঁকা সচল রেখা। ক্যারাভ্যান চলছে। কাশেমের উল্লসিত উচ্চস্ব শোনা গেল—আরো জোরে।

বিদ্যুৎগতিতে ধুলোর ঝড় তুলে মরুদস্যুর দল ছুটলো ক্যারাভ্যান লক্ষ্য করে। এক

10.9.2010

পরেই দেখা গেল ক্যারাভ্যানের আঁকাবাঁকা রেখাটা ভেঙে গেল। ওরা মরুদস্যুর লোককে দেখতে পেয়েছে। যেদিকে পারছে ছুটছে। কিন্তু মালপত্র আর সওয়ারী পিঠে নিয়ে উটগুলো আর কত জোরে ছুটবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মরুদস্যুর দল ওদের দু'দিক থেকে ঘিরে ধরল। সকালের আকাশটা ভরে উঠল নারী আর শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকারে।

শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। ক্যারাভ্যানের ব্যবসায়ীরা কিছু ভাড়াকরা পাহারাদার নিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই লড়াই শুরু হল প্রথমে। উটের পিঠে কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া ছইগুলো থেকে ভেসে আসতে লাগল ভয়ার্ত কান্না চীৎকার। কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তরোয়ালের ফলা। তারপর তরোয়ালের তরোয়ালের ঠোকাঠুকি মুমূর্ষুদের চীৎকার, গোঙানি।

ফ্রান্সিস একপাশে ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে যুদ্ধ দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যারাভানের প্রহরীরা প্রায় সবাই বালির উপর লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে আরো কয়েকজন তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখল তার মধ্যে একটি কিশোর ছেলে। ছেলেটি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তরোয়াল চালাতে লাগল। পাঁচ-ছয়জন মরুদস্যু ওকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারছে না কেউ! ছেলেটির তরোয়াল চালানোর নিপুণ ভঙ্গী আর দুর্জয় সাহস দেখে মনে-মনে তার তারিফ না করে পারল না। যারা ওকে ঘিরে ধরেছিল তাদেরই দু'জন রক্তাক্ত শরীরে পালিয়ে এল। ছেলেটি তখনও অক্ষত। সবিক্রমে তারায়াল চালাচ্ছে। কিশোর ছেলেটিকে দেখে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, নিজের ছোট ভাইটির কথা। তার ভাইটিও ছিল এমনি তেজী, এমনি নির্ভীক।

এবার আট-দশজন মরুদস্যু ছেলেটিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে ওদের বার বার হার স্বীকার করতে হল।

হঠাৎ দেখা গেল, কাসেম ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল কাসেমের নিশ্চয়, কোন কুমতলব আছে। লড়াই তখন শেষ। ক্যারাভ্যানের দলের মাত্র কয়েকজন পুরুষ তখনও কোন রকমে টিঁকে আছে। বাকী সবাই মৃত, নয় তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। রয়েছে শুধু নারী আর শিশুরা। কাজেই লুঠতরাজ চালাতে এখন আর কোন বাধাই নেই। কিন্তু কাসেমের মতলব বোধহয় কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ঘোড়াটা চালিয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ালো।

কাসেম তক্কে-তক্কে রইল। ছেলেটি তখন ঘোড়ার মুখ উল্টোদিকে ফিরিয়ে অন্য দস্যু ক'টার সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। কাসেম যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে নিচু হয়ে ছেলেটির ঘোড়ার পেটের দিকে জিনের চামড়াটায় তরোয়াল চালাল। জিনটা কেটে দু'টুকরো হয়ে গেল। ঘোড়াটাও আকস্মিক আঘাতে দু'পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল। ছেলেটি জিনসুদ্ধ হুড়মুড় করে গড়িয়ে বালির ওপর গড়িয়ে পড়ে গেল। ঘোড়ার গা থেকে রক্ত ছিটকে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কাসেম অট্টহাসি উঠল। ওর কুৎসিত মুখটা আরো বীভৎস হয়ে উঠল। এবার অন্য দস্যুগুলো ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু কাসেমের ইঙ্গিতে থেমে গেল।

ফ্রান্সিস বুঝল—কাসেমের নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক অভিসন্ধি আছে। ঠিক তাই

কাসেম নিজের ঘোড়াটাকে ছেলেটির কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটির সর্বাঙ্গে রক্তের ছোপ। সে বেশ ক্লান্ত এটাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাসেম নিচু হয়ে তরোয়ালের ডগায় বালি তুলে ছেলেটির চোখে-মুখে ছিটোতে লাগল। দস্যুদলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা ছেলেটিকে চারদিক থেকে ঘিরে মজা দেখতে লাগল। একসময় অনেকটা বালি ছেলেধির চোখে ঢুকে পড়ল সে বাঁ হাতে চোখ রগড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের তলোয়ার ফেলল না ঠিক তখনই বালিতে প্রায় অন্ধ ছেলেটির মাথা লক্ষ্য করে কাসেম তরোয়াল তুললো। ফ্রান্সিস আর সহ্য করতে পারলো না। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়াটাকে কাসেমের সামনে নিয়ে এল! কাসেম কিছু বোঝাবার আগেই কাসেমের উদ্যত তরোয়ালটা আঘাত করল। আগুনের ফুলকি ছুটল যেন। কাসেমের আর তরোয়াল চালানো হল না। কিন্তু ফ্রান্সিস বেকায়দায় তরোয়াল চালিয়ে ছিল। তাই মুঠি আলগা হয়ে ওর তরোয়ালটা ছিটকে পড়ে গেল। কাসেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের তাকাল। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে গর্জে উঠল—'কাফের।' তারপরেই ছুটল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস বিপদ গুনলো। কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে আসছে। ফ্রান্সিসের সাধ্য নেই, খালি হাতে ওকে বাধা দেয়।

—'ফ্রান্সিস!' চাপাস্বরে কে ডাকল। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল। ফজল! ফজল ওর তরোয়ালটা এগিয়ে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস কাসেমের প্রথম আঘাতটা সামলাল। কাসেম আবার তরোয়াল তুলল। ঠিক তখনই সর্দারের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কাসেম ভুলে যেও না, আমরা লুঠ করতে এসেছি।'

কাসেম উদ্যত তরবারি নামাল। শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল। দুজনে কি কথা হল। কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ক্যারাভ্যানের দিকে ইঙ্গিত করল। কি হয় দেখবার জন্যে মরুদস্যুরা এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল। সেই স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে গেল তাদের চীৎকারে। সবাই চীৎকার করতে করতে ছুটল। ক্যারাভ্যানের দিকে। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারাভ্যানের ওপর আবার আর্ত চীৎকার কান্নার রোল উঠল। অবাধ লুঠতরাজ চলল।

এবার ফেরার পালা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলোর ওপর দিয়েই দস্যুর দল ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিস অতটা অমানুষ হতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল সেই ছেলেটি মাটিতে হাঁটু গেড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল নেমে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু উপায় নেই। মরুদস্যুর দল অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে দলের সঙ্গে এসে মিশল। ওরা যখন সেই মরুদ্যানে ফিরে এল তখন সূর্য মাথার ওপরে। চারদিকে বালির ওপর দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটছে যেন।

বিকেলে খেজুর গাছটার তলায় আবার ফজলের সঙ্গে দেখা হল। ফজল বললো

—অতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচালে তুমি ভাই।

—কেন?

—তোমার কাছে বাধা পেয়েই তো কাসেম আর এগোতে সাহস করেনি।

—তা না হ'লে কি করতো?

—সব ক'জনকে মেরে ফেলতো।

—সে কি! মেয়েরা বাচ্চাগুলো—ওরা তো নিরাপরাধ।

—কাসেমের নিষ্ঠুরতার পরিমাপ করতে পারবে না! জাঁহান্নামের ওর ঠাঁই হবে না।

—হুঁ।

—ও কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বে না। সাবধানে থেকো।

—ও আমার কি করবে?

—জানো না তো ভাই, দলের কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না, এমন কি সর্দারও না। হঠাৎ পেছনে কাকে দেখে ফজল থেমে গেল। কাসেম নয়। দস্যু দলের একজন। কাছে এসে ফ্রান্সিসকে ডাকল—এই ভিনদেশী—তোমাকে সর্দার এত্তেলা ডেকে পাঠিয়েছেন।

—চলো, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটার সঙ্গে তাঁবুর দিকে চলল।

* * *

একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সর্দার রুপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস গিয়ে দাঁড়াতে নল থেকে মুখ না তুলে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললো। জাজিমপাতা ফরাসের ওপর বসতে গিয়ে ফ্রান্সিস দেখল, কাসেমও একপাশে বসে আছে। কাসেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকাল, পরক্ষণেই যেন প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। এতক্ষণে সর্দার কেশে নিয়ে ডাকল—'ফ্রান্সিস'।

—বলুন।

—তুমি বিদেশী—আমাদের রীতিনীতি তোমার জানবার কথা নয়। তুমি আজকে যা করেছ, অন্য কেউ হলে তাকে এতক্ষণে বালিতে পুঁতে ফেলা হত।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সর্দার বললো—তোমার ক্ষেত্রে অন্য রকম ব্যবস্থা নিতে হল। তারপর একটু চুপ করে ডাকল—কাসেম।

কাসেম উঠে দাঁড়াল। সর্দার বললো—তুমি ওর সঙ্গে একা লড়তে রাজি আছ?

কাসেম সঙ্গে-সঙ্গে খাপ থেকে একটানে তরবারিটা বের করে বললো—এক্ষুণি।

সর্দার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল—তুমি?

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি রাজী।

—হুঁ। সর্দার গড়গড়ার নলটা মুখে দিল। কয়েকবার টানল। তারপর বলল—রাত্তিরে তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে। তৈরী হয়ে আসবে।

* * *

বালিতে কয়েকটা মশাল পুঁতে রাখা হয়েছে। চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মরুদস্যুদলের লোকেরা। পরিস্কার আকাশে লক্ষ-তারার ভিড়। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বালিতে ফুটফুটে চাঁদের আলো।

ফ্রান্সিসকে আসতে দেখে মরু-দস্যুদলের ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা ভিড় সরিয়ে পথ করে দিল। ফ্রান্সিস সহজ ভঙ্গিতে ভিড়ের মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। একদিকে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তার নিচে সর্দার বসে আছে। সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে কাসেম। হাতে খোলা তরোয়ালে মশালের আলো পড়ে চক-চক করছে। মশালের আলো কাঁপছে তার টকটকে লাল আলখাল্লায়। ওকে দেখতে আরো বীভৎস

লাগছে। ফ্রান্সিস তখনও খাপ থেকে তরোয়াল খোলেনি।

ফজলকে ডেকে সর্দার কি যেন বলল। ফজল কাসেমকে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে এগিয়ে আসতে বলল। ফ্রান্সিসকেও ডাকল। ফ্রান্সিস এবার তরোয়াল খুলল। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে কাসেমের মুখোমুখি দাঁড়াল। সর্দার হাততালি দিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতেই কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কাসেমের তরোয়ালের আঘাত ঠেকাল বটে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে বালির ওপর বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে হাসির হররা উঠল। আবার কাসেম তরোয়াল চালাল। এবারও একই ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস কাসেমের তরোয়ালের ঘা থেকে আত্মরক্ষা করল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাসেমকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। শুরু হল দু'জনের লড়াই। বিদ্যুৎগতিতেই দু'জনের তরোয়াল ঘুরছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় চকচক করছে তরোয়ালের ফলা। ঠং-ঠং—ধাতব শব্দ উঠছে তরোয়ালের ঠোকাঠুকিতে।

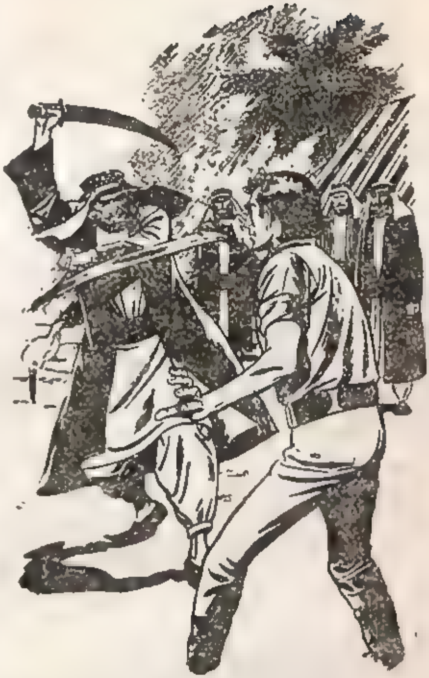
কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে মরু-দস্যুর দল দেখতে লাগল এই তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। দুজনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা প্রচণ্ড আঘাত সামলাতে না পেরে বালিতে কাসেমের পা সরে গেল। কাসেম কাত হয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তরোয়াল চালাল। কাসেম মরীয়া হয়ে সে আঘাত ফেরাল, কিন্তু মুঠি আলগা হয়ে তরোয়াল ছিটকে পড়ল একটু দূরে। কাসেম চিং হয়ে বালিতে পড়ে গেল, ফ্রান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কাসেমের দিকে তাকাল। কাসেমের চোখে মৃত্যুভীতি। মুখ হাঁ করে সে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের ছুঁচলো ডগাটা কাসেমের লাল আলখাল্লায় বিঁধিয়ে একটা টান দিল। লাল আলখাল্লাটা দু'ফালি হয়ে গেল। বুকের অনেকটা জায়গা কেটেও গেল, রক্তে ভিজে উঠল আলখাল্লাটা। মরু-দস্যুদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কোনদিকে না তাকিয়ে ফ্রান্সিস চলল সর্দারের কাছে। ও তো জানে এ রকম দু'জনের মধ্যে তরোয়ালের লড়াইয়ে বেদুইনদের রীতি কী? সর্দার যা বলবে তাই সে করবে।

—'ফ্রান্সিস !' ফজলের অস্পষ্ট আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। খোলা গা, উদ্যত তরোয়াল হাতে কখন কাসেম ছুটে এসেছে। ঠিক ওর মাথার ওপর কাসেমের তরোয়াল। পলকমাত্র সময় হাতে। ফ্রান্সিস উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। কাসেমের তরোয়াল নামল। বাঁ কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা। তরোয়ালের আঘাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফ্রান্সিসের কাঁধ ছুঁয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল কাঁধ থেকে। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় খুন চেপে গেল। কাপুরুষ ! ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসেমের ওপর। কাঁধের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আঘাতের পর আঘাত লাগল। কাসেম সেই তীব্র আক্রমণের সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। পিছিয়ে যেতে-যেতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না সেই আক্রমণের মুখে। তার হাত অবশ হয়ে এল। উপর্যুপরি কয়েকবার আঘাত হেনে সুযোগ বুঝে ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালাল কাসেমের বুক লক্ষ্য করে। কাসেমের গলা দিয়ে শুধু একটা কাতরধ্বনি উঠল। পরক্ষণেই সে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল। বুকে বেঁধা তরোয়ালটা টেনে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর শরীর স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে তখনও হাঁপাচ্ছে।

তরোয়াল যুদ্ধের এই ফলাফল দস্যুদলের কেউই আশা করেনি। কারণ, এর আগে কাসেমের সঙ্গে তরোয়ালের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেককেই তারা মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে। তরোয়াল যুদ্ধে কাসেম ছিল অজেয়। সেই কাসেম আজ একজন ভিনদেশী কাছে শুধু হার স্বীকার করা নয়, একেবারে মৃত্যুবরণ করবে, একটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দস্যুদলে কাসেমের অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে গেল। ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল তারা, কিন্তু ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করবার আগেই সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল, তারপর ধীর পায়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল।

কাঁধের যন্ত্রণাটা অনেকখানি কমেছে। একটু আগে সর্দার একজন লোক পাঠিয়েছিল। এই দলে হেকিমের কাজ করে লোকটা। কি একটা কালো আঠার মত ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটু পরে ব্যথাটাও কমতে শুরু করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। অনেক রাত পর্যন্ত ও জেগে রইল। দেশ ছেড়েছে কতদিন হ'য়ে গেল, তারপর জাহাজে নাবিকের জীবন, বন্ধু জ্যাকব; জাহাজডুবি, সোনার ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ, আর আজ কোথায় এসে পড়েছে। নাঃ, এখন থেকে পালাতে হবে। ছেলেবেলা থেকে যে সোনার ঘণ্টার স্বপ্ন ও দেখেছে, তার হদিস পেতেই হবে। ভাবতে-ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল ! কে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কান পেতে রইল। আবার চীৎকার। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

* * *

ভোর হয়—হয়, সূর্য উঠতে আর দেরি নেই। আবছা আলোয় ফ্রান্সিস দেখল—চার-পাঁচজন ঘোড়সওয়ার দস্যু কাকে যেন দড়িতে হাত বেঁধে বালির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে

নিয়ে চলেছে। লোকটা হাতে বাঁধা দড়িটা টানছে। কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস

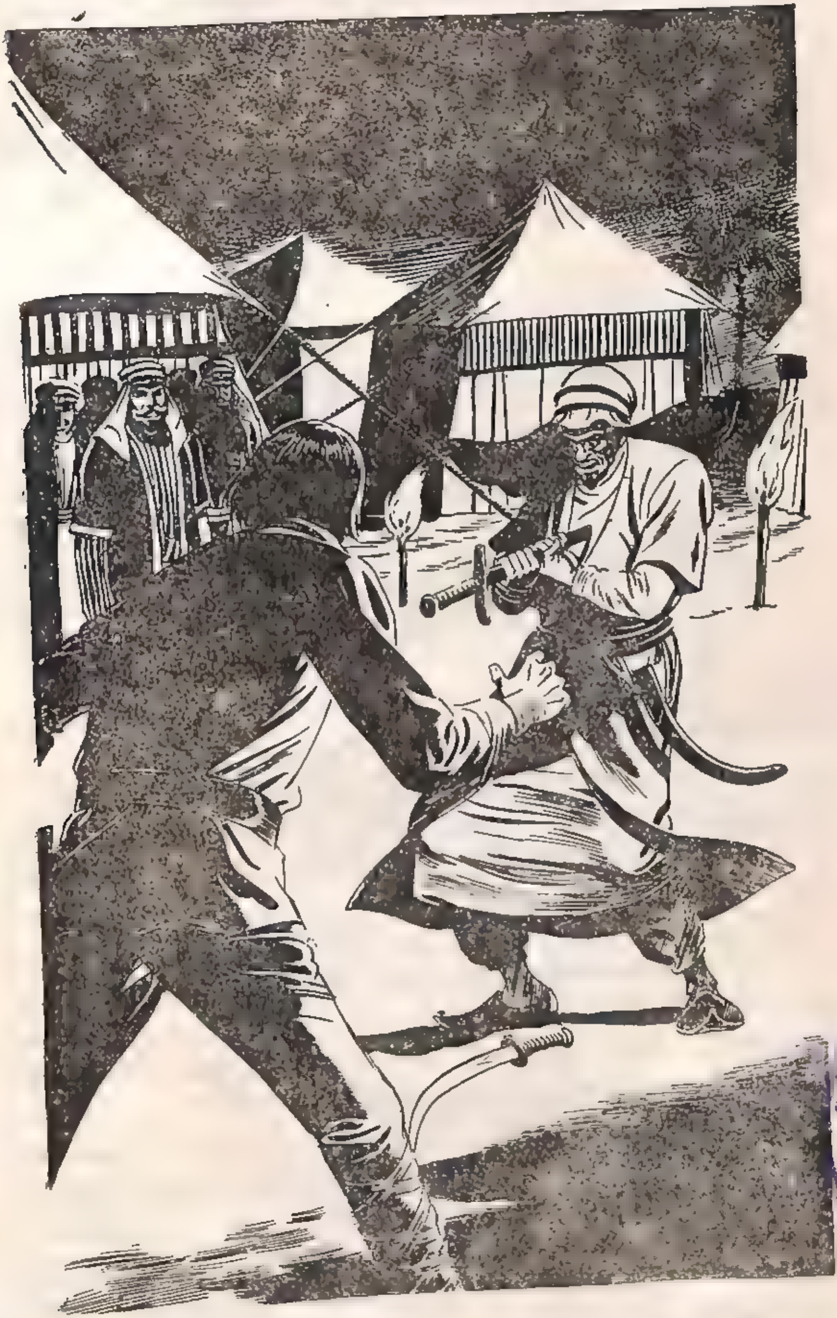

(ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালাল কাসেমের বুক লক্ষ্য করে।)

সেই আবছা আলোতেও চিনল লোকটা আর কেউ না—ফজল। কিন্তু ফজলকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে? হঠাৎ ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল। ফজল বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। পৈশাচিক আনন্দে ওরা ফজলকে বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

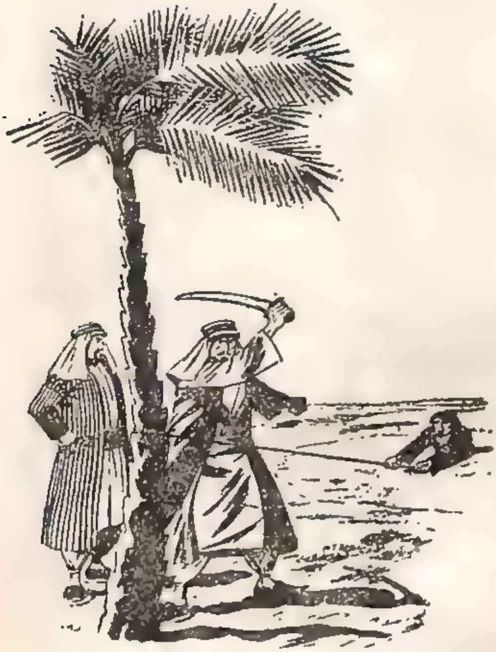

এমন সময় একজন দস্যু মাথার ওপর তরোয়াল তুলল দড়িটা কাটবার জন্য।

ফ্রান্সিস বুঝতে পারল—ফজল ওকে সাহায্য করেছে—প্রাণে বাঁচিয়েছে। সেই অপরাধের শাস্তিটা ওকে পেতে হচ্ছে। ও আর দাঁড়াল না। যে করেই হোক ফজলকে বাঁচাতে হবে! তাঁবুতে ফিরে এসে পোশাক পরে নিল! কোমরে তরোয়াল বাঁধলো। তারপর নিঃসাড়ে খেজুর গাছে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। নিজে চলল ঘোড়াটার আড়ালে। জলাশয়ের ওপাশ দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা উঁচু বালিয়াড়ির পেছনে মরুদ্যানটা আড়াল পড়তে ঘোড়ার পিঠে উঠে বালি উড়িয়ে ঘোড়া ছোটাল।

সূর্য উঠল। সকালের রোদে তেজ কম। তাই ফ্রান্সিসের পরিশ্রম হচ্ছিল কম। বেশী দূর যেতে হল না। ফ্রান্সিস দেখল— একটা নিঃসঙ্গী খেজুর গাছে ফজলের হাত বাঁধা দড়িটার একটা কোণা বাঁধা রয়েছে। আর ফজলকে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফজলের হাত বাঁধা। পা ছুঁড়ে নানাভাবে ও বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারবে কেন? ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দস্যুগুলোর কাছা কাছি আসতেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও শিউরে উঠল! কি সাংঘাতিক! ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। চোরাবালিতে আটকে গেলেই গাছের সঙ্গে বাঁধা ফজলের হাতের দড়িটা কেটে দেবে। ফ্রান্সিসের অনুমানই সত্যি হল। ফজলের একটা মর্মান্তিক চীৎকার ওর কানে এল। দেখল—ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছে। ফজল প্রাণপণ শক্তিতে গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টেনে ধরে চোরাবালি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। এমন সময় একজন দস্যু মাথার ওপর তরোয়ার তুললো দড়িটা কাটবার জন্যে। এক মুহূর্ত। দড়িটা কেটে গেল ফজল চোরাবালির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে ওর চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফ্রান্সিস উল্কার বেগে ঘোড়া ছোটাল। তারপর চলন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে সেই দস্যুটার ওপর পড়ে গেল। দড়ি আর কাটা হল না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। শুধু ডান হাতেই তাকে টানতে হচ্ছিল। কারণ বাঁ হাতটা তখনও প্রায় অবশ হয়ে আছে। দুটো

তিনটে হ্যাঁচ্‌কা টান মারতেই ফজল চোরাবালির গহবর থেকে শক্ত বালিতে উঠে এল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বালিতে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণের শারীরিক নির্যাতন, তার ওপর এই মৃত্যুর বিভীষিকা, এই সবকিছু তার দেহমনের শেষ শক্তিটুকু শুয়ে নিয়েছিল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। দস্যুর দল কি করবে, বুঝে উঠতে পারল না। ফজলকে চোরাবালি থেকে উঠে আসতে দেখে ওদের টনক নড়ল। এবার ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস একবার চারদিক থেকে ঘিরে ধরা দস্যুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চীৎকার করে বলে উঠল—ফজল আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে ওর গায়ে হাত দেবে, আমি তাকে দু'টুকরো করে ফেলব।

ফ্রান্সিসের সেই ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে দস্যুর দল বেশ ঘবড়ে গেল। এটা যে ফ্রান্সিসের শূন্য আস্ফালন নয়, সেটা ওরা বুঝল। গত রাত্রে তার প্রমাণও পেয়েছে ওরা। কাজেই ফ্রান্সিসকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করল না। নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করল। তারপর ঘোড়া ছোটালো সেই মরুদ্যানের দিকে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে ফজলের কাছে এল। জলের পাত্রটা খুলে ফজলের চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। ফজল দু'একবার চোখ পিট্‌পিট্‌ করে ভালো ভাবে তাকাল। মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। ফ্রান্সিস ওর মুখে আস্তে-আস্তে জল ঢেলে দিতে লাগল। জল খেয়ে ফজল যেন একটু সুস্থ হল। ফ্রান্সিস ওর হাতের দাঁড়টা কেটে দিল। তারপর ডাকল—ফজল।

ফজল ম্লান হাসল। ফ্রান্সিস বললো—চলো—ঘোড়ায় বসতে পারবে তো?

ফজল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস ওকে ধরে-ধরে কোনরকমে ঠেলেঠুলে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিল। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে পেছনে বসল। আর সময় নষ্ট না করে ঘোড়া ছোটাল। এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে হবে। বলা যায় না, হয়তো দলে ভারী হয়ে ওরা এখানে আসতে পারে। হলোও তাই। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে দেখল—বালির দিগন্ত রেখায় কালো বিন্দুর মত কালো ঘোড়সওয়ার দস্যুর দল ছুটে আসছে।

ফজল এতক্ষণে যেন গায়ে জোর পেল। সে একবার ফ্রান্সিসের দিকে ম্লান হাসল।

—তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে ভাই।

ফ্রান্সিস হেসে বললো, এখন আমাদের প্রাণের ভয় যায় নি ফজল।

—কেন?

—পেছনে তাকিয়ে দেখ।

ফজল ফিরে তাকাল। ধুলো উড়িয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে মরুদস্যুর দল। একে অসুস্থ ফজলকে ধরে রাখতে হচ্ছে, তার ওপর কাঁধের কাটা জায়গাটার যন্ত্রণা—ফ্রান্সিস খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছিল না। ক্রমেই মরুদস্যুর সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমে আসছিল।

—ফ্রান্সিস?—ফজল ডাকল।

—হুঁ—

—সামনের ঐ যে পাহাড়ের মত একটা বালির ঢিবিটা দেখছো?

—হ্যাঁ।

—ঐ টিবিটার ও'পাশেই একটা মরূদ্যান আছে।

—ওখানেই যাবে ?

—না…না। ঐ টিবিটার আড়ালে আড়ালে আমরা ডানদিকে বাঁক নেব।

—কিন্তু—

—এ-ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। ওরা ধরেই নেবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ মরূদ্যানে আশ্রয় নেব, কারণ আমরা দু'জনেই অসুস্থ—বেশীদূর যেতে পারবো না।

—তা ঠিক।

—কাজেই আমাদের আশ্রয়ের জন্যে অন্য কোথাও যেতে হবে।

—কোথায় যাবে সেটা বলো।

—ডানদিকে মাইল কয়েক গেলেই আমদাদ শহর। একবার ঐ শহরে ঢুকতে পারলে তোমার আর কোন ভয় নেই।

—কেন ?

—ওরা অনেকেই দাগী দস্যু—সুলতানের সৈন্যরা চিনে ফেলবে, এইজন্যে ওরা আমদাদ শহরে ঢুকবে না।

—কিন্তু তুমি ?

—আমি আর কোথাও আস্তানা খুঁজে নেব।

কথা বলতে-বলতে ওরা পাহাড়ের মত উঁচু বালির টিবিটার আড়াল দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছোটাল। অনেকদূর পর্যন্ত আড়াল পেল ওরা। এক সময় টিবিটা শেষ হয়ে গেল। সামনে অনেক দূরে দেখা গেল হলদে সাদা রঙের লম্বা প্রাচীর। ফজল বলল—এই হচ্ছে আমদাদ শহর। আর ভয় নেই।

ফ্রান্সিস পেছনে তাকাল। ধু-ধু বালি। মরুদস্যুর চিহ্নমাত্র নেই।

আমদাদ শহরের প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস দেখল—শহরের পশ্চিমদিকে তামাটে রঙের পাথরের একটা পাহাড়। ফজল আঙুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে বলল—ঐ পাহাড়ের নীচেই সুলতানের প্রাসাদ। আর পাহাড়ের ও'পাশে সমুদ্র।

—সমুদ্র ?—ফ্রান্সিস অবাক হল।

—হ্যাঁ, কেন বল তো ?

—জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে-ভাসতে ঐ সমুদ্রের ধারেই এসে ঠেকেছিলাম। যদি সমুদ্রের ধারে ধারে পশ্চিমদিকে যেতাম, তাহলে আগেই এই শহরে এসে পৌঁছতাম।

—তুমি তাহলে উল্টোদিকে গিয়েছিলে—মরুভূমির দিকে।

গম্বুজওলা শহরের তোরণ। কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা নজরে পড়ল। উটের পিঠে, ঘোড়ায় চড়ে শহরে লোকজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ফজল বলল—এবার ঘোড়া থামাও—আমি এখান থেকে অন্যদিকে চলে যাব।

ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল।

—ফ্রান্সিস ?—ফজল ডাকল।

—হুঁ।

—তোমার তরোয়ালটা আমাকে দাও। ওপরের জামাটাও খুলে দাও।

—কেন ? ফ্রান্সিস একটু অবাক হলো।

—এই পোশাক আর তরোয়াল নিয়ে শহরে ঢুকলে বিপদে পড়বে। আর ভাই কিছু মনে করো না—তোমার ঘোড়াটা আমি নেব। কোথাও আশ্রয় তো নিতে হবে না আমাকে।

—বেশ তো।

—আর একটা কথা।

—বলো।

—শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ, মদিনা মসজিদ। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। মদিনা মসজিদের বাঁ পাশের গলিতে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে মীর্জা হেকিমের বাড়ি। দেখা করে বলো—ফজল পাঠিয়েছে। বিনা খরচে তোমার জখমের চিকিৎসা হয়ে যাবে।

—সে হবে'খন কিন্তু তোমার জন্যে—

—আমার জন্যে ভেবো না। হ্যাঁ ভালো কথা, ফজল কোমর-বন্ধনীর মধ্যে থেকে একটা ছোট সবুজ রঙের রুমাল বের করল। রুমালের গিট খুলে দু'টো মোহর বের করল। বলল—জানো ভাই, এই মোহর দু'টোর পেছনে ইতিহাস আছে। আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ বিরাট এক মরুদস্যুদলের সর্দার ছিল। একটা ক্যারাভ্যান লুঠ করতে গিয়ে সে এই মোহর দু'টো পেয়েছিল। কিন্তু মজার কথা কি জানো। শুনেছি যে লোকটার কাছে মোহর দু'টো ছিল, সে কিন্তু বণিক বা ব্যবসায়ী ছিল না।

—তবে ?

—তার পরনে নাকি ছিল পাদরীর পোশাক।

—পাদ্রী ? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

—হ্যাঁ—তোমাদের ওদিককার লোকই ছিল সে। দাড়ি গোঁফ—কালো জোব্বা পরনে। গোলায় চেন বাঁধা ক্রুশ।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো—পাদরীই ছিল সে।

—কাণ্ড দেখ—ধর্মকর্ম করে বেড়ায়, তার কাছে সোনার মোহর।

—তারপর ?

—তারপর থেকে মোহর দু'টো বরাবর পুরুষানুক্রমে আমাদের কাছেই ছিল। সবশেষে আমার হাতে এসে পড়ে। যাগ—মোহর দু'টো তুমিই নাও।

—না—না।

—ফ্রান্সিস—তুমি তো ঐ দেশেরই মানুষ। ডাকাতি করে পাওয়া জিনিস তুমি নিলে আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

মোহর দু'টো হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস উলটে-পালটে দেখল। একদিকে একটা আবছা মাথার ছাপ। অন্যদিকে আঁকা-বাঁকা রেখাময় নকশার মত কি যেন খোদাই করা। ফ্রান্সিস কোমরবন্ধনী বের করে মোহর দু'টো রেখে দিল।

ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। ফ্রান্সিস ওর তরোয়াল আর ওপরের জামা খুলে দিল। ফজল হঠাৎ আবেগকম্পিত হয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল ফজল বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। বোধহয় ফ্রান্সিসের কল্যাণ কামনা করলো। বিদায় জানিয়ে ফজল উঠল ঘোড়ার পিঠে। তারপর মরুভূমির দিকে ঘোড়া ছোটাল। ফজলরে

কথা ভেবে ফ্রান্সিসের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে ধীর-পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে তোরণ পেরিয়ে আমদাদ শহরে ঢুকল। তারপর শহরে মানুষদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমদাদ শহরটা নেহাৎ ছোট নয়। ফ্রান্সিস বেশিক্ষণ ঘুরতে পারল না। কাঁধটা ভীষণ টনটন করছে। ব্যথাটা কমানো দরকার। ফ্রান্সিস খুঁজে-খুঁজে মীর্জা হেকিমের বাড়িটা বের করল। দেউড়িতে পাহারাদার ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনুনয় করল—ভাই আমি অসুস্থ, চিকিৎসার জন্যে এসেছি।

—সবাই এখানে চিকিৎসার জন্যেই আসে। গম্ভীর গলায় পাহারাদার বলল—আগে হেকিম সাহেবের পাওনা জমা দাও—তারপর।

—আমি গরীব মানুষ—

—তাহ'লে ভাগো!—পাহারাদার চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস পাহারাদারদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল! লোকটা আঁতকে উঠল। কান কামড়ে দেবে নাকি? ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—হেকিম সাহেবকে বলো গে—একজন রোগী এসেছে—ফজল আলি পাঠিয়েছে।

—ফজল আলি কে?

—সে তুমি চিনবে না। তুমি গিয়ে শুধু এই কথাটা বলো।

—বেশ। পাহাদার চলে গেল। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বলল—কি মুশকিল আগে বলবে তো ভাই। আমার চাকরি চলে যাবে। শীগ্‌গির যাও—হেকিম সাহেব তোমাকে ডাকছে।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে ভেতরে ঢুকল। কার্পেট পাতা মেঝে। ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। তার ওপর হেকিম সাহেব বসে আছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। চুল, ভুরু তুলোর মত সাদা। কানে কম শোনেন। কয়েকজন রোগী ঘরে ছিল। তাদের বিদায় করে ফ্রান্সিসকে ডাকলেন। ফ্রান্সিস সব কথাই বলল। মাথাটা এগিয়ে সব কথা শুনে জামাটা খুলে ফেলতে বললেন। ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর একটা কাঁচের বোয়াম থেকে ওষুধ বের করে লাগিয়ে দিলেন। একটা পট্টিও বেঁধে দিলেন। বললেন—দিন সাতেকের মধ্যেই সেরে যাবে। ফ্রান্সিস কোমরে গোজা থলি থেকে একটা মোহর বের করল। তাই দেখে হেকিম সাহেব হা-হা করে উঠলেন—না-না—কিছু দিতে হবে না।

হেকিম সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিস এবার আমদাদ শহর ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। দেখার জিনিস তো কতই আছে। সব কি আর একদিনে দেখা যায়? সুলতানের শ্বেতপাথরের তৈরী প্রাসাদ, প্রাসাদের পিছনে সমুদ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুর্গ, মন্ত্রীর বাড়ি, বিরাট ফুল বাগিচা, বাজার-হাট এসব দেখা হল। বেড়াতে-বেড়াতে খিদে পেয়ে গেল খুব। কিন্তু খাবে কি করে? খাবারের দোকানে তো আর মোহর নেবে না। সুলতানী মুদ্রাও তো সঙ্গে কিছু নেই। ফ্রান্সিস একটা সোনা-রূপার দোকান খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

শুঁটকে চেহারার দোকানী খুব মনোযোগ দিয়ে নিকষা পাথরে মোহরটা বারকয়েক ঘষল। তারপর জিজ্ঞেস করলে—এ সব মোহর তো এখানে পাওয়া যায় না—আসল জিনিষ। আপনি পেলেন কোথায়?

—ব্যবসার ধাক্কায় কত জায়গায় যেতে হয়।

—তা তো বটেই। যাকগে—আমি আপনাকে পাঁচশো মুদ্রা দিতে পারি।

—বেশ তাই দিন।

শুটকে চেহারার দোকানীটা মনে মনে ভীষণ খুশী হল। খুব দাঁও মারা গেছে। অর্ধেকের কম দামে মোহরটা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস কিন্তু ক্ষতির কথা ভাবছিল না। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিছু না খেলেই নয়। সুলতানী মুদ্রা তো পাওয়া গেল। এবার খাবারের দোকান খুঁজে দেখতে হয়। খুব বেশী দূর যেতে হল না। বাজারটার মোড়েই জমজমাট খাবারের দোকান। শিক কাবাবের গন্ধ নাকে যেতেই ফ্রান্সিসের খিদে দ্বিগুণ বেগে লেগে গেল। দেরি না করে তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকে রুটি আর শিক কাবাবের ফরমাইশ করল। খাবার দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল। যেভাবে ও খেতে লাগল তা দেখে যে কেউ বুঝে নিতো, ওর রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে। ব্যাপারটা একজনের নজরেও পড়ল। সেই লোকটা অন্য জায়গায় বসে খাচ্ছিল।

এবার ফ্রান্সিসের সামনে এসে লোকটি বসল। ফ্রান্সিস তখন হাপুস-হুপুস খেয়েই চলেছে। লক্ষ্যই করে নি, কেউ ওর সামনে এসে বসেছে। কাজেই লোকটা যখন প্রশ্ন করল—আপনিও বোধহয় আমার মতই বিদেশী।

ফ্রান্সিস বেশ চমকেই উঠেছিল। খেতে-খেতে মাথা নাড়ল।

—আমার নাম মকবুল হোসেন—কার্পেটের ব্যবসা করি।

—ও! ফ্রান্সিস সে কথার কোন উত্তর দিল না। খেয়ে চলল। মকবুলও চুপ করে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হয়। মকবুলের চেহারাটা বেশ নাদুসনদুস। মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। ওর ধৈর্য দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল—একে এড়ানো মুসকিল। লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার কায়দাকানুন ওর নখদর্পণে।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস ঢেঁকুর তুলল। মকবুল এবার নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল—আপনার খাওয়ার পরিমাণ দেখে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিল।

—হাসুক গে। তাই বলে আমি পেট পুরে খাবো না?

—আমিও তাই বলি—মকবুল একইভাবে হেসে বলল—আপনার মত অত সুন্দর স্বাস্থ্য অটুট রাখতে গেলে এটুকু না খেলে চলবে কেন। আলবৎ খাবেন—কাউকে পরোয়া করবেন কেন?

ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হল। এতক্ষণ মকবুল আর কোন কথা বলেনি। এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বলল—জানেন ঠিক আপনার মত আমিও একদিন গোগ্রাসে খাবার গিলেছিলাম। কোথায় জানেন, ওঙ্গালিতে।

—ওঙ্গালি?—ফ্রান্সিস কোনদিন জায়গাটার নামও শোনে নি।

—হ্যাঁ—মকবুল হাসল—ওঙ্গালির বাজারে। কারণ কি জানেন? তার আগে চারদিন শুধু বুনো ফল খেয়ে ছিলাম!

—কেন?

—বেঁচে থাকতে হবে তো! হীরে তো আর খাওয়া যায় না।

—হীরে ? ফ্রান্সিস অবাক হয়ে বেশ গলা চড়িয়েই বলল কথাটা।

—শ্-শ্— । মকবুল ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। তারপর আর একবার চারদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলতে লাগল—এখানকার মদিনা মসজিদের গম্বুজটা দেখেছেন তো ?

—হ্যাঁ !

—তার চেয়েও বড়।

—বলেন কি ?

—কিন্তু সব বেফয়দা।

—কেন ?

—আমরা তো আর জানতাম না, যে হীরেটা নাড়া পেলেই পাহাড়টায় ধ্বস নামবে ?

—আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল ?

—হ্যাঁ, ওঙ্গালির এক কামারকে নিয়েছিলাম হীরের যতটা পারি কেটে আনবো বলে।

—সেটা বোধহয় আর হল না।

—হবে কি করে, তার আগেই ধস নামা শুরু হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন ? এতক্ষণে ফ্রান্সিস উৎসুক হল। মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড় হীরে। শুধু হীরে না বলে হীরের ছোটখাটো পাহাড় বলতে হয়। এও কি সম্ভব ?

—তাহ'লে একটু মুরগীর মাংস হয়ে যাক।

—বেশ ! ফ্রান্সিস দোকানদারকে ডেকে আরো মুরগীর মাংস দিয়ে যেতে বললো।

মাংস খেতে-খেতে মকবুল শুরু করল—কার্পেট বিক্রীর ধান্দায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে জায়গাটা তেকরুর বন্দরের কাছে। আমার ঘোড়ায় টানা গাড়ির চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল ভেঙে ! কাজেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। এই কামারই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূর থেকে গাছগাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুহাটা প্রায় দেখাই যায় না। সূর্যটা আকাশে উঠতে-উঠতে যখন ঠিক গুহাটার সমান্তরালে আসে—সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহাটায় পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে, ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে—তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখছে এই আলোর খেলা। ধরে নিয়েছে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা ! ভূতপ্রেতকেও ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

—আচ্ছা, এই আলোর খেলা কি সারাদিন দেখা যেত।

—উঁ-হু। সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়তো, ততক্ষণেই শুধু—তারপর আবার যেই কে সেই।

—সেই কামারটা এর কারণ জানতে পেরেছিল।

—না, তবে অনুমান করেছি। ও বলেছিল—ঐ আলো হীরে থেকে ঠিক্‌রানি আলো না হয়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লেই সেই আলো কিভাবে ঠিক্‌রোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—ভেবে দেখুন—অত আলো—মানে আমি তো সেই আলো আর রঙের খেলা দেখেছিলাম—মানে—ভেবে দেখুন—হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিক্‌রোয়।

তা-তো বটেই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল! বলল—তারপর?

—তারপর বুঝলেন, একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে আমরা তো রওনা হলাম। যে করেই হোক সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কিছু ঝোপ-ঝাড়, দু-একটা জংলী গাছ আর লম্বা-লম্বা বুনো ঘাস—এছাড়া সেই খাড়া পাহাড়ে গায়ে আর কিস্সু নেই। নিরেট পাথুড়ে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবে চিন্তেই এসেছে বুঝলাম। ও বললো—চলুন—আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামবো। ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি, আর তার আশে-পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধরে নামা যাবে।

সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পৌঁছে দেখি, গুহা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ডাল গুঁড়ি লতাগাছ এসব ধরে, শ্যাওলা-ধরে পাথরের ওপর দিয়ে যন্তর্পণে পা রেখে-রেখে একসময় গুহাটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গা মানে সেই কামরাটাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান, সেটা বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরো দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর?

ফ্রান্সিস তখন এত উত্তেজিত, যে সামনের খাবারের দিকে তাকাচ্ছেও না। মকবুল কিন্তু বেশ মৌজ করে খেতে-খেতে গল্পটা বলে যেতে লাগল।

—দু'জনে গুহাটার ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই—তারপরেই একটা খাদ। খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়ো-খেবড়ো গা—অনেকটা জমাট আলকাতরার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কি রঙ, ঠিক বুঝলাম না! তবে দেখলাম, যে ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন পুঁতে রেখে দিয়েছে।

বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগুলোর ওপর একটা ছুঁচালো মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ

দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিলো। আমি বঙ্গাকে ডাকলাম—বঙ্গা দেখ তো, এটা কিসের ঢিবি ?

বঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই।

ঠিক তখনই সূর্যের আলোর রশ্মির সরাসরি গুহার মধ্যে এসে পড়ল আমরা ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন! সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ। সমস্ত গুহাটার তীব্র চোখঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে বললাম—বঙ্গা শীগ্গির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দুজনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধ করা আলোর বন্যা বয়ে চলল জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললাম, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বঙ্গার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে কোন ? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে—অত বড় হীরে— আমার সব দুখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে—আমি কত বড়লোক হয়ে যাবে—আমি পাগল হয়ে যাবো।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাহলে ঐ অমসৃণ পাথুরে ঢিবিটা হীরে। অত বড় হীরে। এ যে অকল্পনীয়। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় ও কাঁদতে শুরু করছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বঙ্গাকে বললাম—এসো, আগে খেয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু কাকে বলা। বঙ্গা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সেই হীরের ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচালো হাতুড়িটা নিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো হীরে চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বঙ্গা হীরের টুকরো গুলো পকেটে পুরতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—এবার বঙ্গা করল এক কাণ্ড! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা পাথর তুলে নিল। তারপর দুহাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, সোজায় যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা অত সোজা ? সে কথা কাকে বোঝাব তখন ? ও পাগলের মত পাথরের ঘা মেরেই চলল। ঠক্—ঠক্—পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ—

—কি হল ?

—সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভিতর শুনলাম, একটা গম্ভীর গুড়-গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এলো পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। গুহার মুখের কাছে ছুটে এলাম। দেখি—পাহা-

ড়ের মাথা থেকে বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে-ভেঙে পড়ছে । বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া পেয়েছে, তাই এই বিপত্তি । এখন আর ভাববার সময় নেই । গুহা ছেড়ে পালাতে হবে । অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা । ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম । টান দিতেই দেখি—ওটা আল্‌গা হয়ে গেছে । বুঝলাম—যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম, সেটা নড়ে গেছে । এখন দড়িটা কোন গাছের ডালে বা ঝোপে আটকে আছে । একটু জোরে টান দিলাম । যা ভেবেছি তাই । দড়ির মুখটা ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে গেল । এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম । কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না । পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে । ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না । টলে-টলে পড়ে যাচ্ছি । তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম । এখন দড়ি ধরে নামতে হবে । কিন্তু বুঙ্গা ? ও কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল ? এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, বুঙ্গার হুঁশও নেই । ও পাথরটা ঠুকেই চলছে । ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম—বুঙ্গা শীগগির চল—নইলে মরবে । কে কার কথা শোনে । এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল । আবার ওকে থামাতে গেলাম । তখন ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছুঁচোলো মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল । বুঝলাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকেই মেরে বসবে । ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই । গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধুলো ঝুপ-ঝুপ করে পড়তে শুরু করেছে । আর দেরি করলে আমারও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে । পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে ।

তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কিভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না । পর-পর পাঁচদিন ধরে বুনো ফল আর ঝরনার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম । গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম, বুনো জন্তু জানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম । তারপর যেদিন এক সন্ধ্যার মুখে ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখবার মত চমকে উঠেছিল ।"

মকবুলের গল্প শেষ । দু'জনেই চুপ করে বসে রইল । দু'জনের কারোরই খেয়াল নেই যে রাত হয়েছে । এবার দোকান বন্ধ হবে ।

—এই দেখুন—মকবুল ডান হাতটা বাড়াল । মাঝের মোটা আঙুলটায় একটা হীরের আংটি ।

—সেই হীরের টুকরো নাকি ? ফ্রান্সিস বিস্ময়ে প্রশ্ন করল ।

মকবুল মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, বলল—বুঙ্গা যখন হাতুড়ি চালাচ্ছিল তখন কয়েকটা টুকরো ছিটকে এসে আমার জামার আস্তিনে আটকে গিয়েছিল । তখন জানতে পারিনি, পরে দেখেছিলাম ।'

দোকানী এসে তাড়া দিল, রাত হয়েছে দোকান বন্ধ করতে হবে ।

দু'জনে উঠে পড়ল । দোকানীর দাম মেটাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ওর থলিটা বের করল । সুলতানী মুদ্রাগুলোর সঙ্গে মোহরটাও ছিল । মোহরটা দেখে মকবুল যেন হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল । থাকতে না পেরে বলেই ফেলল—মোহরটা একটু দেখব ?

—দেখুন না—ফ্রান্সিস মোহরটা ওর হাতে দিল । ফ্রান্সিস দাম মেটাতে ব্যস্ত ছিল ।

তাই লক্ষ্য করল না মোহরটা দেখতে দেখতে-মকবুলের চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে ও মোহরটা ফিরিয়ে দিল।

—সুন্দর মোহরটা, রেখে দেওয়ার মত জিনিস।

—হুঁ—রাখতে আর পারলাম কই? ফ্রান্সিস সখেদে বলল।

—কেন?

—আর একটা ঠিক একরকম দেখতে মোহরও ছিল।

—কি করলেন সেটা?

—এখানকার বাজারে এক জাহুরীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।

—ইস্—মকবুল মাথা নাড়ল—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই ঠকিয়েছে আপনাকে।

—কি আর করব, নইলে না খেয়ে মরতে হত।

—কোন জহুরীর কাছে বিক্রি করেছেন?

—রাস্তায় চলুন—দেখাচ্ছি।

রাস্তায় নেমে মকবুল জিজ্ঞেস করল—কোথায় থাকেন আপনি?

—এখনো কোন আস্তানা ঠিক করিনি।

—বাঃ,—বেশ—মকবুল হাসল—চলুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—সুলতানের এতিমখানায়।

—এতিমখানায়!

—নামেই এতিমখানা—গরিব মানুষরা থাকতে পায় না। আসলে বিদেশীদের আড্ডাখানা ওটা।

—চলুন—মাথা তো গোঁজা যাবে।

রাস্তায় আসতে-আসতে ফ্রান্সিস মকবুলকে জহুরীর দোকানটা দেখাল। মকবুল গভীরভাবে কি যেন ভাবছিল। দোকানটা দেখে মাথানেড়ে শুধু বলল—ও।

ফ্রান্সিস আন্দাজও করতে পারেনি মকবুব মনে-মনে কি ফন্দি আঁটছে।

মকবুলের কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই এতিমখানা বিদেশী ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা। কত দেশের লোক যে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। আফ্রিকার কালো-কালো কোঁকড়া চুল মানুষ যেমন আছে, তেমনি নাক চ্যাপ্টা কুতকুতে চোখ মোঙ্গল দেশের লোকও আছে।

মকবুল একটা ঘরে ঢুকল। দু'জন লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর বিছানা খালি, ওটাই বোধহয় মকবুলের বিছানা। ঘরের খালি কোণটা দেখিয়ে মকবুল বলল—ওখানেই আপনার জায়গা হয়ে যাবে, সঙ্গে তো আপনার বিছানা-পত্তর কিছুই নেই?

—না।

—আমার বিছানা থেকেই কিছু কাপড়-চোপড় দিচ্ছি, পেতে নিন। ফ্রান্সিস বিছানা-মত একটা করে নিল। সটান শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল ঘরের অন্য দু'জন লোকের সঙ্গে মকবুল মৃদুস্বরে কি যেন কথাবার্তা বলছে। সে সব কথার অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

* * *

ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। লোকজনের কথাবার্তায় এতিমখানা সরগরম। ফ্রান্সিস পাশ ফিরে মকবুলের বিছানার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! কোথায় মকবুল? মকবুলের বিছানাও নেই। পাশের বিছানায় লোকটি তখন দু'হাত ওপরে তুলে মুখ হাঁ করে মস্ত বড় হাই তুলছিল। ফ্রান্সিস তাকেই জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, মকবুল কোথায়?

লোকটা মৃদু হেসে হাতের চেটো ওল্টাল, অর্থাৎ সে কিছুই জানে না। মরুক গে এখন হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাওয়ার চেষ্টা দেখতে হয়, ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে ফ্রান্সিস দেখল, ঘরের আর একজন তখন ফিরছে। কিন্তু মকবুল একেবারেই বেপাত্তা। ফ্রান্সিস খেতে যাবে বলে থলেটা কোমর থেকে বের করল, কিন্তু এ কি? থলে যে একেবারে খালি। সুলতানী মুদ্রাগুলো তো নেই-ই, সেই সঙ্গে মোহরটাও নেই। সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভুঁই। কে চেনে ওকে? মাথা গোঁজার ঠাঁই না হয় এই এতিমখানায় জুটল। কিন্তু খাবে কি? খেতে তো দেবে না কেউ। তার ওপর কাঁধের ঘা'টা এখনও শুকোয় নি। শরীরের দুর্বলতাও সবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ও একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সিস চোখে অন্ধকার দেখল।

ওর চোখমুখের ভাব দেখে ঘরের আর দু'জনেও বেশ অবাক হল। হল কি ভিনদেশী লোকটার? ওদের মধ্যে একজন উঠে এল। লোকটার চোখের ভুরু দুটো ভীষণ মোটা মুখটা থ্যাবড়া। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে?

ফ্রান্সিস প্রথমে কথাই বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল—হল কি? ও-রকম ভাবে তাকিয়ে আছেন?

—আমার সব চুরি গেছে।

—ও, তাই বলুন। লোকটা নির্বিকার ভঙ্গীতে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। বলল—এটা এতিমখানা—চোর, জোচ্চোরের বেহেস্ত মানে স্বর্গ আর কি? তা কত গেছে?

ফ্রান্সিস আন্দাজে হিসেব করে বলল। মোহরটার কথাও বলল।

—ও বাবা। মোহর-ফোহর নিয়ে এতিমখানায় এসেছিলেন? কত সরাইখানা রয়েছে, সেখানেই গেলেই পারতেন।

—মকবুলই তো যত নষ্টের গোড়া।

—কে মকবুল?

—কাল রাত্তিরে যার সঙ্গে আমি এসেছিলাম।

—কত লোক আসছে-যাচ্ছে।

—কেন, আপনারা তো কথাবার্তা বলছিলেন মকবুলের সঙ্গে বেশ বন্ধুর মত।

—হতে পারে। হাত উল্টে লোকটা বলল।

ফ্রান্সিস লোকটার ওপর চটে গেল। একে ওর এই বিপদ—কোথায় লোকটা সহানুভূতি দেখাবে তা নয়, উল্টে এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দোষ ফ্রান্সিসের।

ফ্রান্সিস বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল—আপনারা মকবুলকে বেস ভাল করেই চেনেন, এখন বেগতিক বুঝে চেপে যাচ্ছেন।

অন্য বিছানায় আধশোয়া লোকটা এবার যেন লাফিয়ে উঠল। বলল—তাহলে আপনি

কি বলতে চান, আমরা একটা গাঁট কাটার।

—আমি সেকথা বলিনি।

—আলবাৎ বলেছেন। ভুরু মোটা লোকটা বিছানা ছেড়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার আগেই ওর গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরল। কাঁধে জখমের কথা ভেবে ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আর বলবি? লোকটা ফ্রান্সিসকে ঝাঁকুনি দিল।

—কি?

—আমরা গাঁটকাটার।

—আমি সেকথা বলিনি।

—তবে রে! লোকটা ডান হাতের উল্টো পিঠ ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসের গালে মারল এক থাপ্পড়। অন্য লোকটি খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর নিজের গেল টাকা চুরি, আবার উল্টে ওকেই চোরের মার খেতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর লোকটা কিছু বোঝবার আগেই হাঁটু দিয়ে ওর পেটে মারল এক গুঁতো। লোকটা দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ল। অন্য লোকটা এরকম কিছু একটা হতে পারে, বোধহয় ভাবতেই পারেনি। এবার সে তৎপর হল। ছুটে ফ্রান্সিসকে ধরতে এল। ফ্রান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সোজা ঘুঁষি চালাল। লোকটা চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল—এর পরের ধাক্কা সামলানো মুশকিল হবে। কাজেই আর দেরি না করে এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে এল। ভুরু মোটা লোকটাও পেছনে ধাওয়া করল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে হুড়কো তুলে দিয়েছে। বন্ধ দরজার ওপর দুমদাম লাথি পড়তে লাগল ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে এতিমখানা থেকে বেরিয়ে এল।

এতবড় আমদাদ শহর। এত লোকজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কোথায় খুলবে মকবুলকে কিন্তু ফ্রান্সিস দমল না। যে করেই হোক মকবুলকে খুঁজে বেরতে হবে। সব আদায় করতে হবে। তারপর বন্দরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে ইউরোপের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা। জাহাজ পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু মকবুলকে না খুঁজে বের করতে পারলে কিছুই হবে না। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে না খেয়ে মরতে হবে।

সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াল ফ্রান্সিস। বাজার, বন্দর, অলি-গলি কিছুই বাদ দিল না দিল না। কিন্তু কোথায় মকবুল? একজন লোককে তো মকবুল ভেবে ও উত্তেজনার মাথায় কাঁধে হাত রেখেছিল। লোকটা বিরক্ত মুখে ঘুরে দাঁড়াতে ফ্রান্সিস ভুল ভাঙল। মাফ-টাফ চেয়ে সে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। উপোসী পেটে সারাদিন ওই ঘোরাঘুরি। দুপুরে অবশ্য একফালি তরমুজ চালাকি করে খেয়েছিল।

বাজারের মোড়ে একটা লোক তরমুজের ফালি বিক্রি করছিল। খিদেয় পেট জ্বলছে। সেই সঙ্গে জলতেষ্টা। একফালি তরমুজ খেলে খিদেটাও চাপা পড়বে সেই সঙ্গে তেষ্টাটাও দূর হবে। কিন্তু দাম দেবে কোথেকে? অগত্যা চুরি। ফ্রান্সিস বুদ্ধি ঠাওরাল। রাস্তার ধারে এক দঙ্গল ছেলে খেলা করছিল। ফ্রান্সিস ছেলেগুলোকে ডাকল। ছেলেগুলো কাছে আসতে বলল—ঐ যে তরমুজওলাটাকে দেখছিস, ও কানে শুনতে পায় না। তোরা

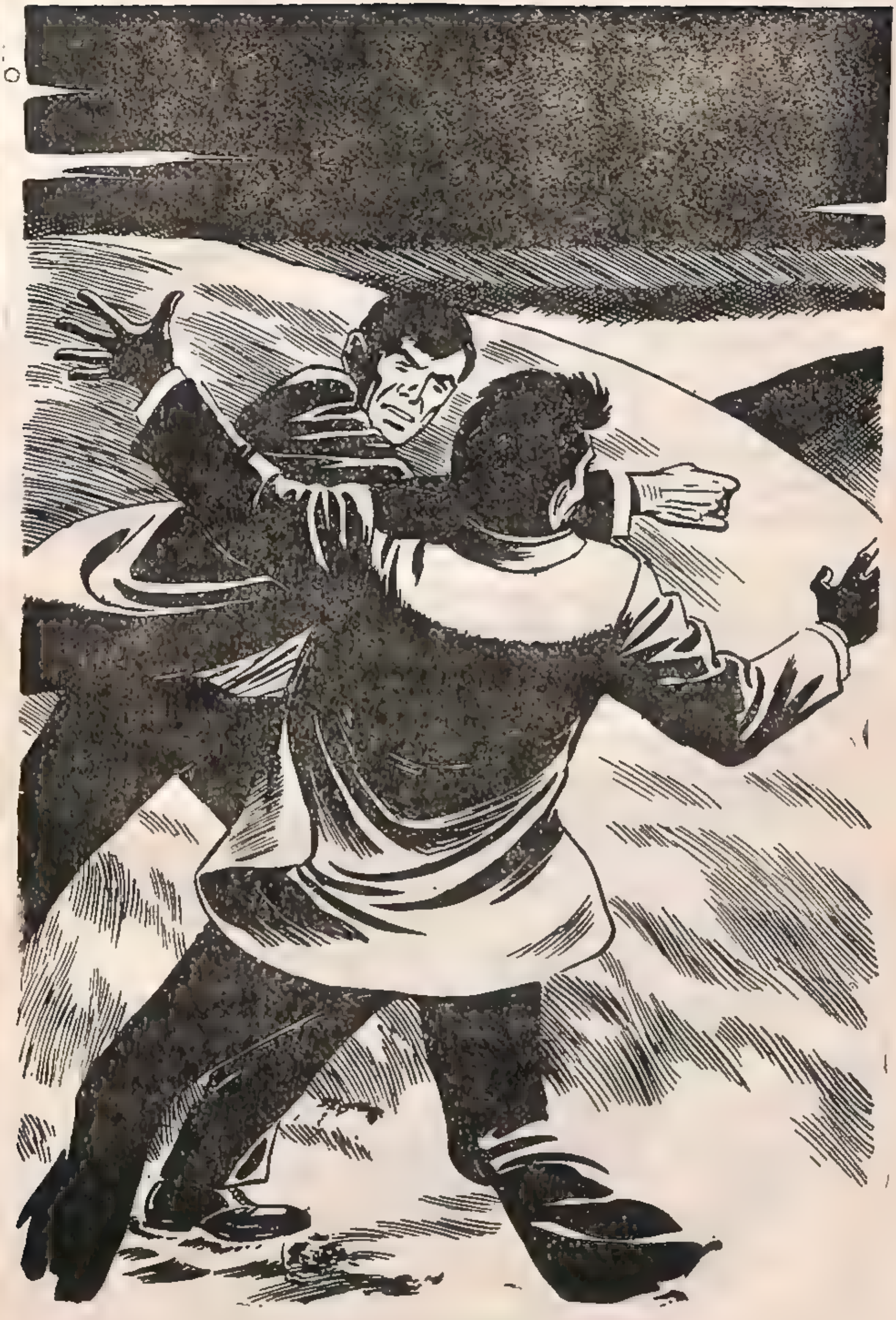

ফ্রান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি মারল।

গিয়ে ওর সামনে বলতে থাক—"এক ফালি তরমুজ দাও—তা'হলেই তুমি কানে শুনতে পাবে।" লোকটা খুশী হয়ে ঠিক তোদের একফালি করে তরমুজ দেবে।"

ব্যস্! ছেলের দঙ্গল হল্লা করতে-করতে ছুটে গিয়ে তরমুজওলাকে ঘিরে ধরল। তারপর তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল—"এক ফালি তরমুজ দাও—তা'হলে তুমি কানে শুনতে পাবে।" তরমুজওলা পড়ল মহা বিপদে। আসলে ওর কানের কোন দোষ নেই। ও ভালই শুনতে পায়। ও হাত নেড়ে বারবার সেকথা বোঝাতে লাগল। কিন্তু ছেলেগুলো সেকথা শুনবে কেন?

তাদের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। একদিকের ছেলেগুলোকে তাড়ায় তো অন্যদিকের ছেলেগুলো মাছির মত ভিড় করে আসে। আর সেই নামতা পড়ার মত চিৎকার। অতিষ্ঠ হয়ে তরমুজ-ওলা ঝোলা কাঁধে নিয়ে অন্যদিকে চলল। ছেলের দলও চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পিছু নিল, এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। তরমুজওলাকে ডেকে দাঁড় করাল, বলল—তোমার ঝোলায় সব চাইতে বড় যে তরমুজটা আছে, বের কর। তরমুজওলা বেশ বড় একটা তরমুজ বের করল।

—এবার কেটে সবাইকে ভাগ করে দাও।

ছেলেরা তো তরমুজ খেতে পেয়ে বেজায় খুশী। ফ্রান্সিসও একটা বড় টুকরো পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কামড় দিল, আঃ কি মিষ্টি! হাপুস-হুপুস করে খেয়ে ফেলল তরমুজের টুকরোটা। তরমুজওলা এবার দাম চাইলে ফ্রান্সিস অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল—বাঃ, এই যে তুমি বললে কানে শুনতে পেলে সবাইকে তরমুজ খাওয়াবে।

—ও কথা আমি কখন বললাম। তরমুজওলাও অবাক।

—এই তো তুমি কানে শুনতে পাচ্ছো।

ছেলেগুলো আবার চেঁচাতে শুরু করল—কানে শুনতে পাচ্ছে—কানে শুনতে পাচ্ছে।

তরমুজওলা ছেলেদের ভিড় ঠেলে আসার আগেই ফ্রান্সিস ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

একফালি তরমুজে কি আর খিদে মেটে? তবু সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাল। যদি ওর দুরাবস্থার কথা শুনে কারো দয়া হয়, এই আশায় ফ্রান্সিস কয়েকটা খাবারের দোকানে গেল। সব চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বলল। অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই ওকে বিশ্বাস করল না।

সন্ধ্যার সময় শাহীবাগের কোণার দিকে একটা পীরের দরগার কাছে এসে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। একটু জিরোনো যাক। দরগার সিঁড়িতে বসল ফ্রান্সিস। ভেতরে নজর পড়তে দেখল অনেক গরিব-দুঃখী সার দিয়ে বসে আছে। সবাইকে একটা করে পোড়া রুটি আর আলুসেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসের খিদের জ্বালা বেড়ে গেল। সেও সারির মধ্যে বসে পড়ল। যে লোকটা রুটি দিচ্ছিল, সে কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে একটু অবাকই হল। খাবার দিল ঠিকই, কিন্তু মন্তব্য করতেও ছাড়ল না—"অমন ঘোড়ার মত শরীর—সুলতানের সৈন্যদলে নাম লেখাও গে যাও।" ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মুখ নীচু করে পোড়া রুটি চিবুতে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা, মা'র কথা মনে পড়ল। কোথায় এই অন্ধকার খোলা উঠোনে ভিখিরিদের সঙ্গে বসে পোড়া রুটি আলুসেদ্ধ খাওয়া আর কোথায় ওদের সেই ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত খাওয়ার ঘর, ফুলের

কাজকরা সাদা টেবিল ঢাকনা, ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁটা-চামচ, বাসনপত্র। খাওয়ার জিনিসও কত। কত বিচিত্র স্বাদ সে-সবের। সেই সঙ্গে মা'র সস্নেহ হাসিমুখ—ফ্রান্সিস চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। না—না—এসব ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয়। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। বাড়ির নিশ্চিন্ত বিলাসী জীবনের নাম জীবন নয়। জীবন রয়েছে বাইরে—অন্ধকার ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, আগুন-ঝরা মরুভূমিতে তরবারির ঝলকানিতে, দেশবিদেশের মানুষের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে।

তখনও রাত বেশী হয় নি। ফ্রান্সিস এতিমখানায় এসে ঢুকল। খুঁজে-খুঁজে নিজের ঘরটার দিকে এগোল। সেই লোক দু'টো কি আর আছে ? ব্যবসায়ী লোক—হয়তো এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সকালে নিশ্চয়ই দরজায় ধাক্কাধাক্কি লাথি মারার শব্দে আশেপাশের ঘরের লোক এসে দরজা খুলে দিয়েছে। তারপর দুপুর নাগাদ পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

দরজাটা বন্ধ। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত মনেই দরজাটা ঠেলল। দরজা খুলে গেল। এই সেরেছে। সেই মূর্তিমান দু'জনেরই একজন যে। মোটা ভুরু নাচিয়ে লোকটা ডাকল—এসো ভেতরে। ফ্রান্সিস নড়ল না। লোকটা এবার হেসে ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখতেগেল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। ঘরে চোখ পড়তে দেখল অন্য লোকটাও রয়েছে।

—তোমার এখনও রাগ পড়েনি দেখছি। লোকটা হাসল।

ফ্রান্সিস ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি বললো—বিশ্বাস করো ভাই—সকালে তোমার সঙ্গে আমরা যে ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

ফ্রান্সিস তবু নড়ল না।

—ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এসো। যদি মাফ্ চাইতে বলো—আমরা তাও চাইবো।

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকল। লোকটা দরজা বন্ধ করতে উদ্যোগ হতেই ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। বললো—দরজা বন্ধ করতে পারবে না।

—বেশ। লোকটা হেসে দরজা খোলা রেখেই ওর কাছে এগিয়ে এল। বলল—এবার বিছানায় বসো।

ফ্রান্সিস নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। অন্য লোকটি তখন একটা পাত্র হাতে এগিয়ে এল। পাত্রটা ফ্রান্সিসের সামনে রেখে বলল—খাও। সারাদিন তো তরমুজের একটা ফালি ছাড়া কিছুই জোটেনি।

ফ্রান্সিস বেশ অবাক্ হল। এসব এই লোকটা জানলো কি করে ? মোটা ভুরুঅলা লোকটা এবার বলল—তুমি ঠিকই ধরেছো। মকবুল আমাদের খুবই পরিচিত। ওকে আমরা ভালো করেই জানি। গাঁট কাটার মত নোংরা কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের উল্টে তোমাকেই সন্দেহ হয়েছিল।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। তাই দুপুরবেলা আমরা দু'জন তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে-ছিলাম। পেলামও তোমাকে। বাজারের মোড়ে তুমি তখন তরমুজ খাচ্ছিলে।

ফ্রান্সিস হাসল। লোকটা বললো—খুব বেঁচে গেছো। তুমিও গা-ঢাকা দিলে আর ঠিক তক্ষুণি সুলতানের পাহারাদার এল। অবশ্য কোন বিপদ হলে আমরাও

তৈরী ছিলাম তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

—তা'হলে তো তোমরা সবই দেখেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তখনি বুঝলাম—তুমি মিথ্যে বলোনি। সত্যি তোমার সব চুরি হয়েছে—নইলে ওরকম চুরির ফন্দী আঁটো। খাও ভাই—এবার হাত চালাও—খেয়ে নাও আগে।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না—নিঃশব্দে খেতে লাগল। পরোটা, মাংস। উটের দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টি—চেটেপুটে খেয়ে নিল সব।

এবার মোটা ভুরুঅলা লোকটা বলল—শোন ভাই—আমার নাম হাসান। কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরাও খোঁজে থাকব—মকবুলের দেখা পেলেই সব আদায় করে লোক মারফৎ তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি তো এখানেই থাকবে?

—হ্যাঁ, যতদিন না জাহাজের ভাড়া যোগাড় করতে পারি।

—বেশ। এবার তাহ'লে ঘুমোও অনেক রাত হল।

ফ্রান্সিসও আর জেগে থাকতে পারছিল না। পরদিন কি খাবে, কি ভাবে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করবে—এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল—হাসান আর তার বন্ধু দু'জনেই চলে গেছে! ঘরে শুধু ও একা। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল—এবার কি করা যায়? কি করে প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করবে, অর্থ জমাবে, মকবুলকে খুঁজে বের করবে? দেশে তো ফিরতে হবে? তারপর নিজেদের একটা জাহাজ নিয়ে সোনার ঘণ্টা খুঁজতে আসতে হবে। সঙ্গে আনতে হবে সব বিশ্বস্ত বন্ধুদের। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। এখন কি করা যায়? ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা বুদ্ধি এল। আচ্ছা মকবুলের সেই মস্ত বড় হীরের গল্পটা বাজারের কুয়োর ধারে বসে লোকদের শোনালে কেমন হয়? কত বিদেশী বণিকই তো বাজারে আসে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে গল্পটা আগে শুনেছে! তাহ'লেই মকবুলের খোঁজ পাওয়া যাবে। কারণ মকবুল ছাড়া এই গল্প আর কে বলবে? ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এতক্ষণে বাজারে লোকজন আসতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। কুয়োর ধারে খেজুরগাছটার তলায় বসতে হবে।

"সে এক প্রকাণ্ড হীরে! মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড়! কি চোখ টাকা ধাঁধানো আলো তার! দু'হাতে চোখ ঢেকে আমরা শুয়ে পড়লাম। সমস্ত গুহাটা তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে যেতে লাগল।" ফ্রান্সিস গল্পটা বলে চলল। লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। কেউ-কেউ বিরূপ মন্তব্য করে গেল—"গাঁজাখুরী গপ্পো—অত বড় হীরে হয় নাকি?" কিন্তু বেশির ভাগ লোকই হাঁ করে গল্পটা শুনল। প্রথম দিন তো। ফ্রান্সিস খুব একটা গুছিয়ে গল্পটা বলতে পারল না। তবু লোকের ভালো লাগল। গল্প বলা শেষ হলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাতে কিছু মুদ্রা দিল। দেখাদেখি আরো কয়েকজন কিছু মুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। যাক, প্রাণে, বেঁচে থাকার একটা সহজ উপায় পাওয়া গেল। গল্প বলে যদি এইরকম রোজগার হয়, তাহ'লে খাওয়ার ভাবনাটা অন্ততঃ মেটে।

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস আরো গুছিয়ে গল্পটা বলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বেশ ভালো গল্প বলিয়ে হয়ে গেল। গল্পটাকে আরো বাড়িয়ে, আরো নানারকম

রোমহর্ষক ঘটনা যোগ করে লোকদের শোনাতে লাগল। রোজগারও হতে লাগল। কিন্তু এতদিনে এমন কাউকে পেল না, যে গল্পটা আগে শুনেছে। তবু ফ্রান্সিস হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন গল্পটা বলে যেতে লাগল। সেই বাজারের কুয়োটার ধারে, খেজুরগাছটার নীচে বসে।

একদিন ফ্রান্সিস গল্পটা বলছে—“সব সময় নয়, যখন সূর্যের আলো সরাসরি গুহাটায় এসে পড়ে, তখনি দেখা যায় আলোর খেলা, কত রঙের আলো—”

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল—এ গল্পটা আমার শোনা।

ফ্রান্সিস গল্প বলা থামিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশী ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কোথায় শুনেছেন গল্পটা?

—হায়াৎ-এর সরাইখানায়।

—যে লোকটা গল্পটা বলেছে, তার নাম জানেন?

—না, সে নাম বলেনি।

—দেখতে কেমন?

—মোটাসোটা গোলগাল, বেশ হাসিখুশী।

ফ্রান্সিসের আর বুঝতে বাকি রইল না—লোকটা আর কেউ নয়, মকবুল। কিন্তু হায়াৎ? সে তো অনেকদূর। তিনদিনের পথ। উটের ভাড়া গুণবে, সে ক্ষমতা তো নেই। এদিকে শ্রোতারা অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল। গল্পটা শেষ হয় নি। ফ্রান্সিস ফিরে এসে আবার গল্পটা বলতে লাগল।

কিছুদিন যেতেই কিন্তু গল্পটা লোকের কাছে পুরোনো হয়ে গেল। কে আর একই গল্প প্রতিদিন শুনতে চায়? বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ী যারা আসত, তারাই যা দু-চারজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনত। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—রোজগার বাড়াতে হলে আরও লোক জড়ো করতে হবে। নতুন গল্প শোনাতে হবে। এবার তাই সে সোনার ঘণ্টার গল্পটা বলতে শুরু করল। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ানো শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস সুন্দর ভঙ্গীতে গল্পটা বলতে থাকে—“নিশুতি রাত। ডিমেলোর গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গলে আগুনের আভা কিসের? সোনা গলানো চলছে। বিরাট কড়াইতে সোনা গলিয়ে ছাঁচে ফেলা হচ্ছে। কেন না সোনার ঘণ্টা তৈরী হবে। কবে তৈরী শেষ হবে? ডাকাত পাদরীরা সোনা গলায় আর ছাঁচে ঢালে।” খুব জমে যায় গল্পটা। শ্রোতারা অবাক হয়ে সোনার ঘণ্টার গল্প শোনে। কেউ-কেউ মন্তব্য করে—“যত সব বাজে গল্প।” চলেও যায় কেউ-কেউ। কিন্তু নতুন লোক জড়ো হয় আরো বেশী। এক সময় গল্পটা শেষ হয় শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলে—‘সোনার ঘণ্টা এখনও আছে, এই সমুদ্রের কোন অজানা দ্বীপে। তোমরা ভাই খুঁজে দেখতে পার।’

গল্প শেষ। শ্রোতাদের ভিড় কমতে থাকে। ফ্রান্সিস হাত পাতে। যাবার আগে অনেকেই কিছু-কিছু সুলতানী মুদ্রা হাতে দিয়ে যায়। গল্পটা শুনে সবাই যে খুশী হয়েছে—ফ্রান্সিস বোঝে। ও আরও উৎসাহ পায়, কিন্তু বিপদ হল, এই গল্পটা বলতে গিয়েই।

জোব্বাপরা নিরীহগোছের লম্বামত চেহারার একজন লোক মাঝে-মাঝে ফ্রান্সিসের

পেছনে দাঁড়িয়ে গল্প শুনত। ফ্রান্সিস যেদিন থেকে প্রথম সোনার ঘণ্টার গল্পটা বলতে লাগল, সেদিন থেকে লোকটা প্রত্যেক দিন আসতে লাগল। অনেকেই গল্প শুনতে জড়ো হয়। সবাইকে তো আর মনে রাখা যায় না। ফ্রান্সিস আপন মনে গল্পই বলে যায়।

একদিন ফ্রান্সিস যেই গল্পটা শেষ করেছে, পেছন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করল—তুমি সেই সোনার ঘণ্টা দেখেছ ?

ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখল। গোবেচারা গোছের চেহারা। রোগা আর বেশ লম্বা। ফ্রান্সিস ওকে আমলই দিল না। হাত বাড়িয়ে শ্রোতাদের দেওয়া মুদ্রাগুলো দিতে লাগল।

—সেই সোনার ঘণ্টা তুমি দেখেছ ? লোকটা একই সুরে আবার করল প্রশ্নটা।

—না। ফ্রান্সিস বেশ রেগেই গেল।

—সেই ঘণ্টার বাজনা শুনেছ ?

—তোমার কি মনে হয় ?

—আমার মনে হয় তুমি সব জান।

ফ্রান্সিস এবার অবাক্ চোখে লোকটার দিকে তাকাল। ঠাট্টা করে বলল—সবই যদি জানব, তাহ'লে কি এখানে গল্প বলে ভিক্ষে করি ?

—তুমি নিশ্চয়ই জানো সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে।

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিতে চাইল। বিরক্তির সুরে বলল—"বারে, গল্প গল্পই—গল্পের ঘণ্টা সোনারই হোক আর রুপোরই হোক, তাকে চোখেও দেখা যায় না—তার বাজনাও শোনা যায় না"।

হঠাৎ লোকটা পরনের জোব্বাটা কোমরের একপাশে সরাল। ফ্রান্সিস দেখল—তরোয়ালের হাতল। লোকটা একটানে খাপ থেকে খুলে চকচকে তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের থুতনির কাছে চেপে ধরে গম্ভীর গলায় বলল—আমার সঙ্গে চলো।

নিরীহ চেহারার মানুষটা যে এমন সাংঘাতিক, ফ্রান্সিস আগে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত ও অবাক্ হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। টুক-টাক কথা থেকে একেবারে থুতনিতে তরোয়াল ঠেকান! ফ্রান্সিস ভাবল, আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

—চল। লোকটা তাড়া লাগাল।

—কোথায় ?

—গেলেই দেখতে পাবে।

এ আবার কোন্ ঝামেলায় পড়লাম! কিন্তু উপায় নেই। লোকটা যেমন তৈরিয়া হয়ে আছে, গাঁইগুঁই করলে হয়তো গলায় তরোয়ালই চালিয়ে দেবে।

—বেশ, চল। ফ্রান্সিস লোকটার নির্দেশমত বাজারের পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। লোকটা খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে ঠিক ওর পেছনে-পেছনে যেতে লাগল।

পথে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস কোন্‌দিকে যেতে হবে, তা বুঝতে না পেরে মাঝে-মাঝে থেমে পড়ছিল, লোকটা ওর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস মনে-মনে কেবল পালাবার ফন্দি আঁটতে লাগল। কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, লোকটা ভীষণ সতর্ক। একটু এদিক-ওদিক ওর পা পড়লেই লোকটা

ধমক্ দিচ্ছে—সোজা হাঁট। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে। ফ্রান্সিস আবার সহজভাবে হাঁটতে লাগল। এবার খুব সরু গলি দিয়ে যেতে লাগল ওরা।

হাত বাড়ালেই বাড়ির দরজা, এত সরু গলি সেটা। ফ্রান্সিস নজর রাখতে লাগল কোন খোলা দরজা পায় কি না। পেয়েও গেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লোকটা তরোয়াল নামিয়ে ওর গায়ের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—কি হল?

ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তড়িৎগতিতে মাথা দিয়ে লোকটার পেটে গুঁতো খেয়ে টাল সামলাতে পারল না, সেই পাথুরে গলিটায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাঁদিকের খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজাবন্ধ করে দিল। তারপরেই ছুটল ভিতরের ঘরের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে গৃহস্থ বাড়ি, কিন্তু লোকজন কেউ নেই সে ঘরে। পাশের একটা ঘরে লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল, বোধহয় ওঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে একটা বোরখা ঝুলছে। যাক্ আত্মগোপনের একটা উপায় পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বোরখাটা পরে নিল, তারপর এক ছুটে ভিতরে উঠোনে চলে এল। দেখল ছাদটা বেশী উঁচু নয়। জানালার গরাদে পা রেখে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে পড়ল। তারপর

ছাদের পর ছাদ লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হতে-হতে বেশ দূরে চলে এল। এবার নামা যেতে পারে। এই জায়গায় ফ্রান্সিস মারাত্মক ভুল করল। আগে থেকে দেখে নিল না গলিটা ফাঁকা আছে কিনা। কাজেই লাফ দিয়ে পড়বি তো পড়, একটা লোকের নাকের ডগায় সে পড়ল। লোকটা বোধহয় গানটান করে। আপন মনে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে যাচ্ছিল। একটা বোরখা পরা মেয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল দেখে তো ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা হাঁ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার আগেই ওর ঘাড়ে এক রন্দা মারল। ব্যস! লোকটার মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দটি বেরুল না। সে বেচারা কলাগাছের মত ধপাস করে পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটল গলি পথ দিয়ে। একটু পরেই একটা পাতকুয়ো। কুয়োটার ওপরে কপিকল লাগাল। দড়ি দিয়ে চামড়ার থলিতে করে মেয়েরা জল তুলছে। কুয়োটার চারপাশে বোরখা পরা মেয়েদের ভিড়। সবাই জল নিতে এসেছে। ফ্রান্সিসও সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু হলে হবে কি? সেদিন ফ্রান্সিসের কপালটা সত্যিই মন্দ ছিল। সে তখনও জানত না সমস্ত এলাকাটাই সুলতানের সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে।

বাড়ি-বাড়ি ঢুকে তল্লাশী, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একটু পরেই সুলতানের সৈন্যরা কুয়োতলায় এসে হাজির। কুয়োতলার চারপাশের বাড়িতে তল্লাশী শেষ হল। ঠিক তখনই সৈন্যরা একজন লোককে ধরে নিয়ে এল। লোকটা হাত মুখ নেড়ে কি যেন বলতে লাগল। বোরখার আড়াল থেকে ফ্রান্সিস সবই দেখছিল। সে লোকটাকে চিনতে পারল। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সে এই লোকটার সামনেই এসে পড়েছিল। এবার আর রক্ষে নেই সৈন্যদের দল নেতা চিৎকার করে কি যেন হুকুম দিল। সব সৈন্য দল বেঁধে তরোয়াল উঁচিয়ে কুয়োতলার দিকে আসতে লাগল। মেয়েরা ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

সৈন্যদের নেতা হাত তুলে অভয় দিল। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু' তিনজনের জলের পাত্র ভেঙে গেল। যে যেদিকে পারল পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৈন্যরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল এই সুযোগ।

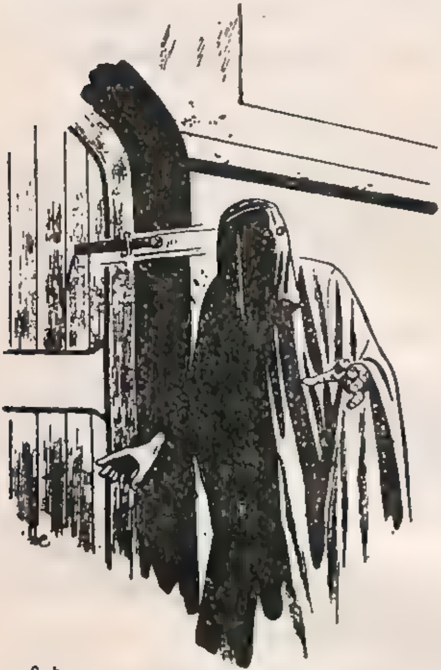

ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গেল।

ফ্রান্সিস কুয়োতলার পাথর বাঁধানো চত্বর থেকে এক লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সামনের বাড়িটা লক্ষ্য করে। দরজার কাছে পৌঁছেও গেল। কিন্তু—শন্—ন্—ন্ একটা ছুরি ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গেল। একটুর জন্যে ওর ঘাড়ে লাগেনি।

—পালাবার চেষ্টা করো না। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ফ্রান্সিস আর নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। ওর গা থেকে কেউ যেন বোরখা খুলে নিল। ফ্রান্সিস দেখল সেই রোগা লম্বামত লোকটা।

লোকটা হেসে বলল—আর হেঁটে নয়—এবার ঘোড়ায় চেপে চল।

ফ্রান্সিসের আর পালান হল না। ফ্রান্সিসকে রাখা হল মাঝখানে। চারপাশে সৈন্যদল ওকে ঘিরে নিয়ে চলল। ওর পাশেই চলল সেই রোগা লম্বামত লোকটা। আমদাদের পাথর বাঁধানো রাজপথে অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল। ওরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে। ফ্রান্সিস তখনও জানতে পারেনি, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ও সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল। তবু কৌতূহল যেতে চায় না।

ব্যাপারটা কি? ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?

সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্রান্সিসও এগিয়ে চলল। আড়চোখে একবার লম্বামত লোকটাকে দেখে নিল! লোকটা নির্বিকার। কোন কথা না বলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, ফ্রান্সিস এবার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—গেলেই দেখতে পাবে। লোকটা শান্ত স্বরে বলল।

—তবু আগে থেকে জানতে ইচ্ছে করে।

—সুলতানের কাছে।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলে কি! দেশের সুলতান! দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর। ফ্রান্সিসের মত নগণ্য একজন বিদেশীর সঙ্গে কি সম্পর্ক তাঁর?

—কিন্তু আমার অপরাধ?

—সোনার ঘণ্টার হদিশ তুমি জান।

—আমি কিছুই জানি না।

—সুলতানকে তাই বলো। এখন বকবক বন্ধ কর, আমরা এসে গেছি!

বিরাট প্রাসাদ সুলতানের। ফ্রান্সিস প্রাসাদটা দেখছে আগে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে। আজকে প্রাসাদে ঢুকছে। স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন সে এই প্রাসাদে ঢুকবে।

মস্তবড় খিলানঅলা দেউড়ি পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা পাথর বাঁধানো চত্বর। চত্বরটায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল—ঠক্—ঠক্। এক কোণার দিকে ঘোড়াশাল। সেখানে ঘোড়া থেকে নামল সবাই। এবারে সামনে সেই লম্বামত লোকটা চলল। তারপর ফ্রান্সিস। পেছনে তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্য। ওরা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল।

বিরাট-বিরাট দরজা—ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল ওরা। সবগুলো ঘরই সুসজ্জিত দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে। রঙীন কাঁচ বসানো শ্বেতপাথরের দেয়াল। এখানে-ওখানে সোনালী রঙের কাজকরা লতা-পাতা ফুল। লাল টকটকে গদিতে মোড়া ফরাস, বসবার জায়গায় বড়-বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ছাদ থেকে। দরজা জানালা মীনে করা। সুন্দর কারুকাজ তাতে। দরজায়-দরজায় ঝকঝকে বর্শা হাতে দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বামত লোকটাকে দেখেই ওরা পথ ছেড়ে দিতে লাগল। একটা ঘরে ঢুকে লোকটা হাততালি দিল। সৈন্য দুজন দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরটা অন্য ঘরের তুলনায় ছোট। মাঝখানে লাল গদিমোড়া বাঁকানো পায়ার টেবিল দু'পাশের বসবার জায়গাগুলোও লাল গদিমোড়া। দেয়ালে, দরজায়, জানালায় অন্য ঘরগুলোর চেয়ে বেশী কারুকাজ। লোকটা ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বসল। লোকটা ভেতরের দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। কেমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গি। ফ্রান্সিসের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—সুলতান আসছেন—উঠে দাঁড়িয়ে আদাব করবে।

ভেতরে দরজা দিয়ে সুলতান ঢুকলেন। ফ্রান্সিস সুলতান রাজা-বাদশাহের কাহিনী শুনেছেই এতদিন। চোখে দেখেনি কোনদিন। আজকে প্রথম দেখল। সুলতান বেশ দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ যেন দুধে-আলতায় মেশান। দাড়ি-গোঁফ সুন্দর করে ছাঁটা। মাথায় আরবীদের মতই বিড়েবাঁধা সাদা দামী কাপড়ের টুকরো। তবে পরনে জোব্বা নয়, একটা আঁটোসাঁটো পোশাক। তাতে সোনা দিয়ে লতাপাতার কাজ করা। বুকে ঝুলছে একটা মস্তবড় হীরে বসানো গোল লকেট। গলায় মুক্তোর মালা। সুলতানকে দেখেই লম্বামত লোকটা মাথা নুইয়ে আদাব করল। লোকটার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও আদাব করল। সুলতান ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি?

—ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে ভাল করে সুলতানের মুখের দিকে তাকাল। সুলতানের চোখের দৃষ্টিটা ফ্রান্সিসের ভাল লাগল না। কেমন ক্রূরতা সেই দৃষ্টিতে। বড় বেশী স্থির, মর্মভেদী।

—তুমি বাজারে যে গল্পটা বল—সোনার ঘণ্টার গল্প?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—মানে পেটের দায়ে—

—গল্পটা কোথায় শুনেছ ?

—দেশে—বুড়ো নাবিকদের মুখে।

—তোমার কি মনে হয় ? গল্পটা সত্যি না মিথ্যে ?

—কি করে বলি ? তবে সত্যিও হতে পারে।

—সুলতানের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বললেন—ওকথা বলছ কেন ?

—আমি সেই সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনেছি।

সুলতান ক্রূর হাসি হাসলেন, বললেন—শুধু বাজনা শোনা নয়, একমাত্র তুমিই জানো সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে, কেমন করেই বা ওখানে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বলল—বিশ্বাস করুন সুলতান, আমি এসবের বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

—তুমি নিজের চোখে সোনার ঘণ্টা দেখেছ। সুলতান দাঁত চেপে কথাটা বললেন।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বুঝল—ভীষণ বিপদে পড়েছে সে। এমন লোকের খপ্পরে পড়েছে, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যে যাই বলুক না কেন, যতই বোঝাবার চেষ্টাই করুক না কেন—সুলতান কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। তবু ফ্রান্সিস বোঝাবার চেষ্টা করল—সুলতান—আমি বললাম তো সোনার ঘণ্টার বাজনা আমি শুনেছি। তখন প্রচণ্ড ঝড়ে আর ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। কোত্থেকে বাজনার শব্দটা আসছে, কতদূরে সেটা, এসব ভাববার সময় কোথায় তখন ?

—মিথ্যেবাদী ফেরেববাজ। সুলতান গর্জন করে উঠলেন। তারপর আঙুল নেড়ে লম্বামত লোকটাকে কি যেন ইশারা করলেন। লোকটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিল—চলো।

ঘরের বাইরে আসতেই সৈন্য দু'জন, সামনে সেই লোকটা। ফ্রান্সিস ভেবেই পেল না, তাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাসাদের পেছন থেকেই শুরু হয়েছে পাথরে বাঁধানো পথ। দু' পাশে উঁচু প্রাচীর টানা চলে গেছে দুর্গের দিকে। কালো থমথমে চেহারার সেই বিরাট দুর্গের দিকে তারা ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। এই দুর্গেই তাকে বন্দী করে রাখা হবে। কতদিন কে জানে ? ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। সব শেষ। সোনার ঘণ্টার স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই এই দুর্গের অন্ধকার কোন ঘরে—লোকচক্ষুর অন্তরালে—অনাহারে-অনিদ্রায় তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই তার ভাগ্যের লিখন। আর তার মুক্তি নেই। কড়কড় শব্দ তুলে দুর্গের বিরাট লোহার দরজার খুলে গেল। ফ্রান্সিস বাইরের মুক্ত পৃথিবীর হাওয়া বুক ভরে টানল। তারপর অন্ধকার স্যাঁতসেতে দুর্গের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

যে ঘরে ফ্রান্সিসকে রাখা হল, সেই ঘরটার দেওয়াল এবড়োখেবড়ো পাথর দিয়ে গাঁথা। দু'পাশে দুটো মশাল জ্বলছে। তাতে অন্ধকারটা যেন আরো ভীতিকর হয়ে উঠেছে। দেয়ালে দুটো মস্তবড় লোহার আংটা লাগানো। তাই থেকে শেকল ঝুলছে। সেই

শেকল দিয়ে ফ্রান্সিসের দু'হাত বেঁধে রাখা হয়েছে।

সারারাত ঘুমুতে পারেনি ফ্রান্সিস। দু'টো হাত শেকলে বাঁধা ঝুলছে। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে? তন্দ্রা আসে। শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু লোহার শেকলে টান পড়তেই ঝনঝন শব্দ ওঠে। তন্দ্রা ভেঙে যায়। যে ক'জন পাহারাদার দরজার কাছে আছে, যে পাহারাদার খাবার দিয়ে গেছে—সবাইকে সে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে—'আমাকে এই শাস্তি দেবার মানে কি? কি অপরাধ করেছি আমি?' কিন্তু পাহারাদারগুলো বোধহয় বদ্ধ কালা আর বোবা। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে অথবা আপন মনে নিজেদের কাজ করে গেছে। কথাও বলেনি, তার কথা যে ওদের কানে গেছে মুখ দেখেও তা মনে হয়নি। ঘুম হ'ল না। হবার কথাও নয়। শেকলে ঝুলে ঝুলে কি ঘুম হয়? তন্দ্রার মধ্য দিয়ে রাত কাটল। একসময় ভোর হ'ল। সামনে একটা জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখা গেল। সারারাত ঘুম নেই। চোখ দু'টো জ্বালা করছে।

একটু বেলা হয়েছে তখন। হঠাৎ লোহার দরজায় শব্দ উঠল—ঝন্ ঝনাৎ। ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিস দেখল—সুলতান ঢুকছে। পেছনে সেই লম্বামত লোকটা। তার পেছনে মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, কালো আলখাল্লা পরা আর একটা লোক। তার হাতে চাবুক। সে চাবুকটা পেঁচিয়ে মুঠো করে ধরে রেখেছে।

—এই যে সাহেব—কেমন আছো? সুলতান ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—যাক গে—সুলতান ব্যস্তভাবে বললেন—আমার তাড়া আছে। কি ঠিক করলে? সারারাত ভাবার সময় পেলে।

—কোন্ ব্যাপারে? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

সুলতান হো-হো করে হেসে উঠলেন—তুমি তো বেশ রসিক হে—সব জেনেশুনে রসিকতা করছো—তাও আমার সঙ্গে।

—আমি যা জানি বলেছি—এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।

সুলতান একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন—সোনার ঘণ্টা আমার চাই। তার জন্যে যদি তোমার মত দু'চারশ লোকের মৃতদেহ ডিঙিয়ে যেতে হয়—আমি তাই যাবো। তবু সোনার ঘণ্টা আমার চাই।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান আঙুল তুলে ইঙ্গিত করলেন। চাবুক হাতে লোকটা এগিয়ে এল। কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো পাগড়ি। মুখটা দেখা না গেলেও শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। যেন খুশীতে জ্বলজ্বল করছে। কি নিষ্ঠুর! ফ্রান্সিস ঘৃণায় মুখ ফেরাল।

ঝপাৎ—চাবুকের আঘাতটা পেটের কাছ থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। ঝপাৎ—আবার চাবুক। তার সবটুকু শরীরে লাগল না। তবু হাতটা জ্বালা করে উঠল। সুলতান হাত তুলে চাবুক থামাতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন—এখনও বলো কোথায় আছে সেই সোনার ঘন্টা?

—আমি যা জানি বলেছি।

ঝপাং—আবার চাবুক। "বন্ধ মুখ কি করে খুলতে হয় আমি জানি।" কথাটা বলে সুলতান চাবুকওয়ালার দিকে তাকালেন। বললেন, যতক্ষণ না কথা বলতে চায়—ততক্ষণ চাবুক চালাবে। কিছু বলতে চাইলে—সুলতান আঙুল দিয়ে লম্বামত লোকটাকে দেখালেন—'রহমানকে খবর দেবে'। কালো পোশাক পরা চাবুকঅলা মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব করল। সুলতান দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোলেন। রহমানও পেছনে-পেছনে চলল।

ঝপাং—চাবুকের শব্দে ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

কিন্তু আশ্চর্য! এবারের চাবুকটা ওর গায়ে পড়ল না—পড়ল দেয়ালে। আবার ঝপাং—। এবারও দেওয়ালে লাগল। লোকটা কি নিশানা ঠিক করতে পারছে না? ঝপাং—ঝপাং—হঠাৎ কয়েকবার দ্রুত চাবুকটা দেয়ালে মেরে লোকটা চাবুক হাতে ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। যেন ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা করেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা—এমনি ভঙ্গিতে ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর কপালের কাছ থেকে পাগড়িটা ওপরের দিকে তুলল। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল—ফজল! এবার ফ্রান্সিস ভালোভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকাল। আরে এ তো সত্যিই ফজল! মুখে ভুষোমত কি মেখেছে তাই চেনা যাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—ফজল।

ফজল ঠোঁটে হাত রখল। তারপর ফিসফিস করে বলল—সামনে জানালাটা দেখেছো!

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে উত্তর দিলে।

—গরাদ নেই।

—হ্যাঁ।

—সোজা ওখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। খাড়া পাহাড়ের গা—কোথাও মরবার ভয় নেই—নীচে সমুদ্রের জল, তারপর ডুব সাঁতার, পারবে তো?

—নিশ্চয় পারবো।

এমন সময় দুজন সৈন্য ঘরে ঢুকল। ফজল সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাবুক চালাল। এবারে চাবুকের ঘা'টা ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল। ফ্রান্সিসের মুখ দিয়ে কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। সৈন্যদের একজন বলল—কি হল এখনও যে মুখ থেকে শব্দ বেরুচ্ছে।

ফজল ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে-চেয়ে চোখ টিপে বলল—এই শেষ ঘা—এটা আর সহ্য করতে হচ্ছে না বাছাধনকে। বলেই চাবুক চালাল—ছপাং। ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল না। দেয়ালে লেগেই শব্দ উঠল।

ফ্রান্সিস অজ্ঞান হবার ভঙ্গি করল। হাত ছেড়ে দিয়ে শেকলে ঝুলতে লাগল।

—এঃ। নেতিয়ে পড়েছে—একজন সৈন্য ফজলকে লক্ষ্য করে বলল—আর মেরো না।

ফজল চটে ওঠার ভান করল—তোমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করো গে যাও। আমি এই ভিনদেশীটাকে একেবারে নিকেশ করে ছাড়বো।

—তাহ'লে তোমারই গর্দান যাবে। একজন সৈন্য বলল।

—কেন?

—সুলতান বলেছেন, যে করেই হোক এই ভিনদেশীটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—নইলে

সোনার ঘণ্টার হদিস দেবে কে ?

—হুঁ, তা ঠিক। তাহ'লে এখন থাক, কি বল ?

—দু'জন সৈন্যই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ফজল চাবুকটা হাতে পাকাতে-পাকাতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—যাঃ —খুব জোর বেঁচে গেলি।

সবাই চলে গেল। ক্যাঁচ-কোঁচ্ শব্দ তুলে দরজাটা বন্ধ হল। পাহারাদার দরজায় তালা লাগাল।

ফ্রান্সিস এবার আস্তে-আস্তে শব্দ না করে উঠে দাঁড়াল। জানালাটার দিকে ভালো করে তাকাল। ফজল ঠিকই বলেছে। জানালাটায় কোন গরাদ নেই। পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে কেউ নেমে যাবে এটা অসম্ভব। তাই বোধ হয় সুলতান জানালাটাকে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন মনে করেননি। জানালার ওপাশে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস কেবল পালাবার ফন্দি করতে লাগল। যে করেই হোক পালাতেই হবে। পালাতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয়—আফশোসের কিছু নেই। কারণ না পালাতেও তার মৃত্যু অবধারিত।

পরের সমস্তটা দিন কেউ এল না। একজন পাহারাদার শুধু খাবার দিয়ে গেল। সুলতানও এলো না—চাবুক মারতে ফজলও এল না। কি ব্যাপার ?

ফ্রান্সিস ভাবল—হয়তো সুলতান সদয় হয়েছেন। সে যে সত্যিই সোনার ঘণ্টার হদিস জানে না, এটা বোধহয় সুলতান বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই ফ্রান্সিসের ভুল ভাঙাল। সুলতান যে কত বড় শয়তান, সে পরিচয় পেতে বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের একটু পরে তিনচারজন পাহারাদার এল ফ্রান্সিসের ঘরটায়। বড়-বড় সাঁড়াশি দিয়ে একটা গনগনে উনুন ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা। ফ্রান্সিস অবাক্। উনুন দিয়ে কি হবে ? ফ্রান্সিস দেখল—দুটো লম্বা লোহার শিক উনুনটায় গুঁজে দেওয়া হল।

একটু পরেই সুলতান এলেন। সঙ্গে রহমান। ফ্রান্সিস রহমানের পেছনে তাকাল। না ফজল আসে নি। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একমাত্র ভরসা ছিল ফজল। আজকে সেও নেই। ফ্রান্সিস মনকে শক্ত করল। ফজল যা বুদ্ধি দেবার দিয়ে গেছে। এর বেশী ও একা আর কি করতে পারে ? এবার বাঁচতে হলে ফ্রান্সিসকে নিজের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে। সারারাত ধরে যে ফন্দিটা মনে মনে এঁটেছে, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।

—কি হে—চাবুকের মার খেয়েও তো বেশ চাঙ্গা আছ দেখছি। সুলতান মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললেন।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান বললেন—এবার চটপট বলে ফেল বাছাধন, নইলে—

—সুলতান আপনি মিছিমিছি একটা নির্দোষ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন।

—ঠিক আছে সোনার ঘণ্টার হদিসটা বলে ফেল—আমি এক্ষুণি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি।

—আমি যা জানি সেটা—

ফ্রান্সিসের কথা শেষও হল না। সুলতান আঙ্গুল নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার গনগনে উনুন থেকে লাল টকটকে শিক দুটো তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

—এখন বলো—নইলে জন্মের মত চোখ দু'টো হারাতে হবে। সুলতানের চড়া গলা শোনা গেল।

ফ্রান্সিস শিউরে উঠল। মানুষ এমন নৃশংসও হয়? ততক্ষণে লোকটা শিক দুটো ওর চোখের সামনে নিয়ে এসেছে। আগুনের উত্তাপ মুখে লাগছে। চোখের একেবারে কাছে লাল শিক দুটো। লাল টকটকে শিকের মুখ ছাড়া ও আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আর এক মুহূর্ত। পৃথিবীর সমস্ত আলো রং হারিয়ে যাবে চিরদিনের মত। আর দেরি করা যায় না। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল—না—না সব বলছি আমি।

সুলতান ইঙ্গিতে লোকটাকে সরে যেতে বললেন।

—এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে। সুলতান হাসলেন।

—সব বলছি সুলতান। কিন্তু তার আগে আমার হাতের শেকল খুলে দিতে বলুন।

সুলতান ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার এসে ফ্রান্সিসের হাতের শেকল খুলে দিল। দু'হাতে কব্জির কাছে লোহার কড়ার দাগ পড়ে গেছে। সেই দাগের ওপর হাত বুলিয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে পাহারাদারের খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য পাহারাদাররা সাবধান হয়ে গেল। সবাই যে যার তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। এমন কি সুলতানও। ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর তরোয়ালটা দিয়ে পাথরের মেঝেতে দাগ কাটাতে লাগল। সবাই দেখলে ফ্রান্সিস একটা জাহাজের ছবির মত কিছু আঁকছে। সুলতানেরও কৌতূহল। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—সুলতান এই হ'ল আপনার জাহাজ। এখান থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করে আপনাকে যেতে হবে।

সুলতান মাথা ঝাঁকালেন। ফ্রান্সিস এখানে-ওখানে কয়েকটা ঢ্যাড়া দিল, বলল—এইগুলো হল দ্বীপ। জনবসতি নেই। সব কটাই পাথুরে দ্বীপ। এসব পেরিয়ে যেতে হবে একটা ডুবো পাহাড়ের কাছে। ডুবো পাহাড়টা উঁচু হবে—এই ধরুন—ঐ জানালাটা থেকে—ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে জানালাটার দিকে এগোল। বলতে লাগল—এই জানালাটা থেকে হাত পাঁচেক। বলেই ফ্রান্সিস হঠাৎ তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ধরে জানালাটার দিকে তীরবেগে ছুটল, এবং কেউ কিছু বোঝবার আগেই জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের অন্ধকার রাত্রির শূন্যতায় ঝাঁপ দিল। কানের দু'পাশে সমুদ্রের মত্ত হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। বাতাস কেটে ফ্রান্সিস নামছে তো নামছেই।

হঠাৎ—'ঝপাং—'। জলের তলায় তলিয়ে গেল ফ্রান্সিস। পরক্ষণেই ভেসে উঠল—জলের ওপর। সমুদ্রের ভেজা হাওয়া লাগছে চোখেমুখে। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশ। ফ্রান্সিসের সমস্ত দেহমত আনন্দের শিহরণে কেঁপে উঠল। আঃ—মুক্তি!

ওদিকে দুর্গের জানালায়, জানালায়, প্রাচীরের ওপর সৈন্যরা মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে খুঁজছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে নিল। তারপর গভীর সমুদ্রের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। চপ্-চপ্—জল কেটে তীর ঢুকছে। সৈন্যরা আন্দাজে তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস আর মাথা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে ভরসা পেল না। যদি একবার নিশানা করতে পারে! সে ডুব সাঁতার দিতে লাগল। ডুব সাঁতার দিতে-দিতে অনেকটা দূরে চলে এল। পেছন ফিরে দেখল—দুর্গটা। এখনও

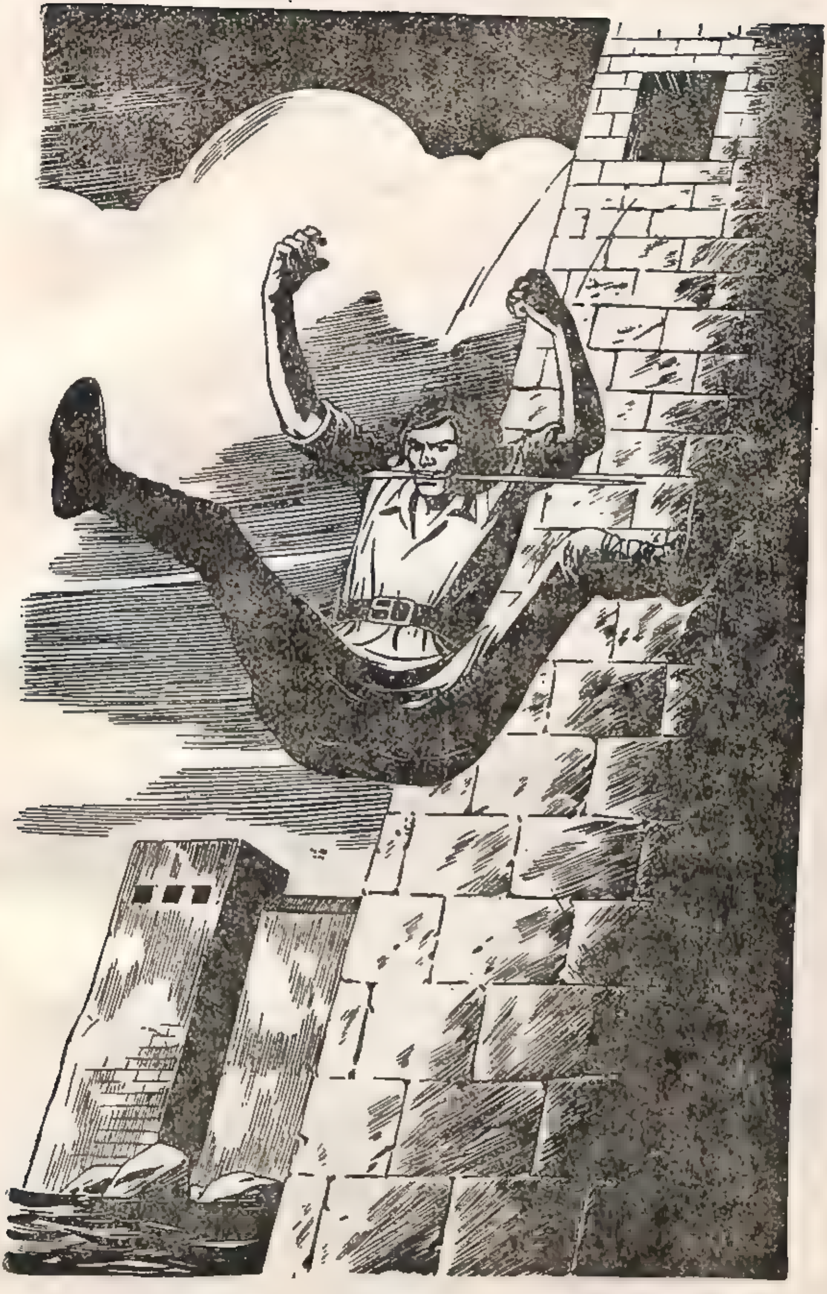

তরোয়ালটা দাঁতে চেপে অন্ধকারেই ফ্রান্সিস শূন্যে ঝাঁপ দিল।

দেখা যাচ্ছে। মশালের ক্ষীণ আলোগুলো নড়ছে। আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস। হঠাৎ কিসের একটা টান অনুভব করল। সমুদ্রের নীচের স্রোত ওকে টানছে। একটু পরেই টানটা আরো প্রবল হল আর তাকে মুহূর্তের মধ্যে অনেকদূরে নিয়ে গেল। এবার ভেসে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখল—সব অন্ধকার। দুর্গের চিহ্নমালাও দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কাটতে লাগল।

সারারাত সাঁতার কাটল ফ্রান্সিস। অবসাদে হাত নড়তে চায় না। তখন কোনরকমে শুধু ভেসে থাকা। এইভাবে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে সাঁতার কেটে চলল। পুবের আকাশে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। একটু পরেই পুবকোণায় লাল সূর্য উঠল। আবার সমুদ্রে সেই সূর্যোদয়ের দৃশ্য। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকাতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। সবকিছু যেন ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।

তবু চেয়ে-চেয়ে সূর্য ওঠা দেখল। কত পরিচিত দৃশ্য। তবু ভালো লাগল। আবার নতুন করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা—আবার এই পুরোনো পৃথিবী, আকাশ, সূর্যোদয় দেখা। ফ্রান্সিসের হাত আর চলছে না। পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলল অনেকক্ষণ। হঠাৎ সামনেই দেখে একটা পাথুরে দ্বীপ। হোক ছোট দ্বীপ—হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম তো নেওয়া যাবে। দ্বীপটার কাছাকাছি আসতেই পায়ের নীচে পাথুরে মাটি ঠেকল। শ্যাওলা ধরা পাথরে পা টিপে দ্বীপটায় উঠল। তারপর একটা মস্ত বড় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কানে আসছে সামুদ্রিক পাখির ডাক আর দ্বীপের পাথরে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ। হঠাৎ ফ্রান্সিস মনে হল—সামুদ্রিক পাখীরা তো এমনি সব দ্বীপেই ডিম পারে। দেখাই যাক না দুটো একটা ডিম পাওয়া যায় কিনা। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পাথরের খাঁজে-খাঁজে গর্ত খুঁজতে লাগল। প্রথম গর্তটায় কিছুই পেল না। শুধু খড়কুটো শুকনো ঘাস। পরের গর্তটায় ডিমের মস্ত খোল হাতে ঠেকল। দুটো ডিম। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ডিম দুটো পাথরে ঠুকে ভেঙে খেয়ে নিল। আঃ কি তৃপ্তি! কিন্তু আর শুয়ে থাকা নয়। এখনও নিরাপদ নয় সে। যদি সুলতানের সৈন্যরা ছোট জাহাজ বা নৌকো নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরোয়? অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম নেওয়া গেল। পেটেও কিছু পড়ল। এবার জলে নামতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা থেকে দূরে পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পূর্ণোদ্যমে সাঁতার কাটতে লাগল। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। উজ্জ্বল রোদ জলের ঢেউয়ের মাথায় ঝিকিয়ে উঠছে। ফ্রান্সিস এবার ডুব দিল—আশা—যদি জলের তলায় কোন স্রোতের সাহায্য পায়। কিন্তু নাঃ। নীচে কোন স্রোত নেই। ওপরে ভেসে ওঠার আগে হঠাৎ দেখল ওর ঠিক হাত পাঁচেক সামনে একটা মাছের লেজের মত কি যেন দ্রুত সরে গেল। প্রাণীটা ঘুরে এ মুখো হতেই ফ্রান্সিসের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

হাঙর! হাঙরের মুখে করাতের দাঁতের মত দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মনে-মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল। এখন ভয় পাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। হাঙরটা আর একবার সাঁৎ করে ওর পায়ের খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। বোধহয় পরখ করে নিচ্ছে—লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা—হাতে অস্ত্র আছে কিনা।

ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—ওটাকে এক আঘাতেই নিকেশ করতে হবে—নইলে—একটু-আধটু খোঁচা খেলে সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। তখন আর এঁটে ওঠা যাবে না। হাঙরের চলাফেরা জলের ওপর থেকে বোঝা যাবে না। ডুব দিয়ে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়ালটা খুলল। তারপর ডুব দিল। ঝাপসা দেখল—হাত দশেক দূরে হাঙরটা এক পাকে ঘুরেই সোজা ওর দিকে ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা শক্ত করে ধরল। হাঙরটা কাছাকাছি আসতেই ফ্রান্সিস দু'পায়ে জলে ধাক্কা দিয়ে আরো নিচে ডুব দিল। হাঙরটা তখন ওর মাথার ওপরে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তরোয়ালটা হাঙরের বুকে বসিয়ে দিল। হাঙরটা শরীর এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে ল্যাজ ঝাপটাতে লাগল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ছাড়ল না। এখন ঐ তরোয়ালটাই একমাত্র ভরসা। এটাকে কিছুতেই হারানো চলবে না। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা ধরে জলের ওপরে মুখ তুলল। তখন ও হাঁপাচ্ছে। কিন্তু হাঙরটা যেভাবে শরীর মোচড়াচ্ছে—তাতে তরোয়ালটা ধরে রাখাই কষ্টকর।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। হাঙরটার পেটে একটা পা চেপে প্রাণপণ শক্তিতে তরোয়ালটা টানল। তরোয়ালটা উঠে এল। সঙ্গে-সঙ্গে গাঢ় লাল রক্তে জলটা লাল হয়ে যেতে লাগল। হাঙরটাও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে পাগলের মত সাঁতার কাটতে লাগল। এই সাংঘাতিক জায়গাটা এখুনিই ছাড়িয়ে যেতে হবে। রক্তের গন্ধ পেলে আরো হাঙর এসে জুটবে—তখন ?

ফ্রান্সিস আর ভাবতে পারল না। সাঁতারের গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

কতক্ষণ এভাবে সাঁতার কেটেছে তা সে নিজেই জানে না, কিন্তু শরীর আর চলছে না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসতে চাইছে। ঠিক তখনই ফ্রান্সিস যেন অস্পষ্ট দেখতে পেল বাতাসে ফুলে ওঠা পাল। জাহাজ! ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জল থেকে মুখ তুলে দু'চোখ কচলে তাকাল। হ্যাঁ—জাহাজই। খুব বেশি দূরে নয়। আনন্দে ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি গায়ের ঢোলাহাতা জামাটা আটকে জলের ওপর নাড়তে লাগল। একটুক্ষণ নাড়ে। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে দম নেয়। আবার নাড়ে। জাহাজের লোকগুলো বোধহয় ওকে দেখতে পেয়েছে। ফ্রান্সিস দেখল—পালগুলো ঘুরে কাৎ হল। জাহাজটা এবার মুখ ঘোরাল ওর দিকে। জাহাজটা ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

'ঝপাং—' জাহাজ থেকে দড়ি ফেলার শব্দ হল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ির ফাঁসটা কোমরে বেঁধে নিল। তারপর দু'হাত দিয়ে ঝোলান দড়িটা ধরল। কপিকলে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ উঠল। নাবিকেরা ওকে টেনে তুলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল—জাহাজের রেলিঙে অনেক মানুষের উৎসুক মুখ। নিচে জলের মধ্যে ল্যাজ ঝাপটানোর শব্দে ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকাল। মাত্র হাত সাতেক নিচে জলের মধ্যে হাঙরের পাল অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল।

জাহাজটা ছিল মালবাহী জাহাজ। নাবিকেরা বেশিরভাগই আফ্রিকার অধিবাসী। কালো-কালো পাথরের কুঁদে তোলা শরীর যেন। ইউরোপীয় সাদা চামড়ার মানুষ যে ক'জন ছিল, ফ্রান্সিস তাদের মধ্যে নিজের দেশের লোক কাউকে দেখতে পেল না।

ফ্রান্সিসের বিছানার চারপাশে নাবিকদের ভিড় জমে গেল। সবাই জানতে চায় ওর কি হয়েছিল, কোথা থেকে আসছিল, যাবেই বা কোথায়? কিন্তু ফ্রান্সিস তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের দেখছিল শুধু। কথা বলার মত শক্তিও অবশিষ্ট নেই। শুধু ইশারায় জানাল—ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। কয়েকজন নাবিক ছুটল খাবার আনতে।

রুটি আর মুরগীর মাংস পেট পুরে খেল ফ্রান্সিস। ওর যখন খাওয়া শেষ হয়েছে তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন। গোলগাল মুখ, পাকানো গোঁফ, ছুঁচালো দাড়ি। ক্যাপ্টেনকে দেখে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেল। যে যার কাজে চলে গেল। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের বিছানার পাশে বসল। জিজ্ঞেস করল—আপনার কি জাহাজডুবি হয়েছিল?

ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করল। বলল—কোথায় যাচ্ছিলেন? বলল—যাবার কথা ছিল মিশরের দিকে। কিন্তু—। ফ্রান্সিস দুর্বল কণ্ঠে বলল।

—ও, তা আর কেউ বেঁচে আছে?

—জানি না।

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াল—আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনি বিশ্রাম করুন, দু'চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন।

—এই জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?

—পর্তুগাল।

খুশীতে ফ্রান্সিসের মন নেচে উঠল। যাক, দেশের কাছাকাছিই যাবে। তারপর ওখান থেকে দেশে যাওয়ার একটা জাহাজ কি আর পাওয়া যাবে না?

তিন দিন ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল না। চার দিনের দিন ডেক-এ উঠে এল। এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করল। রেলিঙে ভর দিয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দু'একজন নাবিক এগিয়ে এসে ওর শরীর ভালো আছে কিনা জানতে চাইল। ফ্রান্সিস সকলকেই ধন্যবাদ দিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা তাকে বাঁচিয়েছে। নানা কথাবার্তা হল ওদের সঙ্গে। কিন্তু ফ্রান্সিস সোনার ঘণ্টার কথা, মরু-দস্যুদের কথা, সুলতানের দুর্গে বন্দী হয়ে থাকার কথা—এসব কিছু বললো না। কে জানে আবার কোন বিপদে পড়তে হয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর ফ্রান্সিসের শুধু শুয়ে-শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগল না। নাবিকের কাজ করবার অভিজ্ঞতা তো ওর ছিলই। একদিন ক্যাপ্টেনকে বলল সেকথা। ছুঁচোলো দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে ক্যাপ্টেন বলল—এখনও তোমার শরীর ভালো সারেনি।

—আমি পারবো।

—বেশ হাল্কা ধরনের কাজ দিচ্ছি তোমাকে।

এ বন্দরে সে বন্দরে মাল খালাস করতে-করতে প্রায় দু'মাস পরে জাহাজটা পর্তুগালের বন্দরে পৌঁছল।

যাত্রা শেষ! বন্দরে জাহাজ পৌঁছতেই নাবিকেরা সব শহরে বেরুল আনন্দ হই-হল্লা করতে। ফ্রান্সিস গেল অন্য জাহাজের খোঁজে। ওর দেশের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে

কিনা। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। পেয়েও গেল একটা জাহাজ। ওদের দেশের রাজধানীতে যাচ্ছে। পরদিন ভোর রাত্রে ছাড়বে জাহাজটা। আগের জাহাজে কাজ করে ফ্রান্সিস যা জমিয়েছিল, সবটাই দিল এই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন ওকে নিতে রাজি হল। জাহাজটা ছোট। মালবাহী জাহাজ। নাবিকের সংখ্যাও কম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল ফ্রান্সিসের। শুধু একজন বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব ভাব হল। ডেক ধোয়া-মোছার সময় ফ্রান্সিস তাকে সাহায্য করত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই বৃদ্ধ নাবিকটি ডেক-এর রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা একবার ফ্রান্সিসকে দেখে নিয়ে আগের মতই আপন মনেই চুরুট খেতে লাগল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনি কত জায়গায় ঘুরেছেন?

নাবিকটি শূন্যে আঙুলটা ঘুরিয়ে বলল—সমস্ত পৃথিবী।

—সোনার ঘণ্টা গল্পটা জানেন?

নাবিকটি ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে তাকাল। এ-রকম একটা প্রশ্ন সে বোধহয় আশা করেনি। মৃদুস্বরে জবাব দিল—জানি।

—আপনি বিশ্বাস করেন?

—করি।

—আমি সেই সোনার ঘণ্টার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম।

—কিছু হদিস পেলে।

—ঠিক বলতে পারছি না, তবে ভূমধ্যসাগরের একটা জায়গায়—নাবিকটি ওকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ম্লান হাসল—কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়—তাই কি না?

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল—তাহ'লে আপনিও—

—হ্যাঁ, ভাই—আমাদের জাহাজ প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তবে আমরা বহু কষ্টে পেছনে হটে আসতে পেরেছিলাম। তাই জাহাজ-ডুবির হাত থেকে বেঁচেছিলাম।

নাবিকটি একটু চুপ করে থেকে বলল—একটা কথা বলি শোন—চারদিকে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল—তুমি বোধহয় গল্পের শেষটুকু জান না।

—জানি বৈকি, ডাকাত পাদরিরা সবাই জাহাজডুবি হয়ে মরে গিয়েছিল।

—না। নাবিকটি মাথা নাড়ল—একজন বেঁচেছিল। সে পরে নিজের জীবন বিপন্ন করে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়ার একটা পথ আবিষ্কার করেছিল। ফিরে আসার অন্য একটা পথও আবিষ্কার করেছিল।

—কেন, যাওয়া-আসার একটা পথ হতে বাধা কি?

নিশ্চয়ই কোন বাধা ছিল। যাকগে—যাওয়া-আসার দু'টো সমুদ্র পথের নকশা সে দু'টো মোহর কুঁদে রেখে রেখেছিল। সব সময় নাকি গলায় ঝুলিয়ে রাখত সেই মোহর দু'টো, পাছে চুরি হয়ে যায়। হয়তো ডাকাত পাদরিটার ইচ্ছে ছিল দেশে ফিরে জাহাজ, লোক-লস্কর নিয়ে যাবে। সোনার ঘণ্টা থেকে সোনা কেটে-কেটে আনবে, কিন্তু—ডাকাত পাদরিটা মারা গেল?

—হ্যাঁ, মরু-দস্যুদের হাতে সে প্রাণ হারাল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল । ফজল তো ঠিক এমনি একটা ঘটনাই ওকে বলেছিল । ফ্রান্সিস আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল—আর সেই মোহর দুটো ?

—মরু-দস্যুরা লুঠ করে নিয়েছিল । তারপর সেই মোহর দুটোর হদিস কেউ জানে না ।

—আচ্ছা, মরু-দস্যুরা কি জানত, মোহর দুটোর নকশা আঁকা আছে ?

—ওরা তো অশিক্ষিত বর্বর, নকশা বোঝার ক্ষমতা ওদের কোথায় ।

এমন সময় কয়েকজন নাবিক কথা বলতে-বলতে ওদের দিকে এগিয়ে এল । ফ্রান্সিস আর কোন প্রশ্ন করল না তার কেবল মনে পড়তে লাগল সেই মোহর দুটোর কথা । আবছা একটা মাথায় ছাপ ছিল, আর কয়েকটা রেখার আঁকিবুকি ।

ঘুম আসতে চায় না ফ্রান্সিসের । নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে ! ইস্—মোহর দুটো একবার ভালো করে দেখেওনি সে । এইবার মকবুলের মোহর চুরির রহস্য ফ্রান্সিসের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল । মকবুল নিশ্চয়ই জানত মোহর দুটোর কথা । তাই ওদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে ওকে এতিমখানায় নিয়ে গিয়েছিল । ফ্রান্সিসের মোহরটা চুরি করেছিল । কিন্তু আর একটা মোহর ? সেটা তো সে আমদাদের বাজারের সেই শুটকো চেহারার জহুরির কাছে বিক্রি করেছে । সেটা হাতে-নাতে না পেলে তো মকবুল পুরো পথের নকশা পাবে না । হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল একটা ঘটনা । আশ্চর্য ! সেদিন ঐ ঘটনার গুরুত্ব সে বুঝতে পারেনি । একদিন সকালে বাজারে যাওয়ার পথে দেখেছিল সেই জহুরির দোকানটার কাছে বহুলোকের ভিড় । দোকানটা কারা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে । আশেপাশের দোকানগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, অথচ ঐ দোকানটা ভেঙেচুরে একশেষ । ফ্রান্সিস শুনল—গত রাত্রে দোকানটায় ডাকাত পড়েছিল । আজকে ঐ ডাকাতির অর্থ পরিষ্কার হল । আসলে মকবুল তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই দোকানটায় হানা দিয়েছিল । লক্ষ্য সেই মোহরটা চুরি করা । তাহলে মকবুলও সোনার ঘণ্টার ধান্ধায় ঘুরছে । আশ্চর্য !

পাঁচদিন পরে জাহাজটা ভাইকিংদের দেশের রাজধানীতে এসে পৌঁছাল । ফ্রান্সিসের যেন তর সয় না । কতক্ষণে শহরে-বন্দরে ভিড়বে । জাহাজটা ধীরে-ধীরে এসে জেটিতে লাগল । জেটির গেট খুলে দিতেই ফ্রান্সিস এক ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ।

* * *

তখন সকাল হয়েছে । আবছা কুয়াশায় ঢেকে আছে শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল ফ্রান্সিস । 'টক-টক-টক-টক' ঘোড়ার গাড়ি চলল পাথর বাঁধানো পথে শব্দ তুলে । ফ্রান্সিসের আবাল্য পরিচিত শহর । খুশিতে ফ্রান্সিস কি করবে বুঝে উঠতে পারল না । একবার এই জানালা দিয়ে তাকায়, আর একবার ঐ জানালা দিয়ে । কতদিন পরে দেশের লোকজন, পথঘাট দেখতে পেল !

বাড়ির গেট-এর লতাগাছটা দুদিকের দেয়ালে বেয়ে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে । ফ্রান্সিস ওটাকে চারাগাছ দেখে গিয়েছিল । কত অজস্র ফুল ফুটেছে গাছটায় । গেট ঠেলে ঢুকল ফ্রান্সিস । প্রথমেই দেখল মা'কে । বাগানে ফুলগাছের তদারকি করছে । ফ্রান্সিস শব্দ না করে আস্তে-আস্তে মা'র পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো । সেই ছোটবেলা সে মা'কে এমনি

করেই চমকে দিত। ওদের বুড়ো-মালিটা হঠাৎ-মুখ তুলে ফ্রান্সিসকে দেখেই প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর ফোকলা মুখে একগাল হাসল। মা ওকে হাসতে দেখে ধমক লাগাল। তবু হাসছে দেখে মা পেছন ফেরে তাকাল। বয়সের রেখা পড়েছে মা'র মুখে। বড় শীর্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে মাকে। ফ্রান্সিস আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরল। মা'র কান্না আর থামে না। ফ্রান্সিসের মাথায় হাত বুলোয় আর বিড়বিড় করে বলে —পাগল, বদ্ধ পাগল তুই—আমার কথা একবারও মনে হয় না তোর ? এ্যাঁ—পাগল কোথাকার—

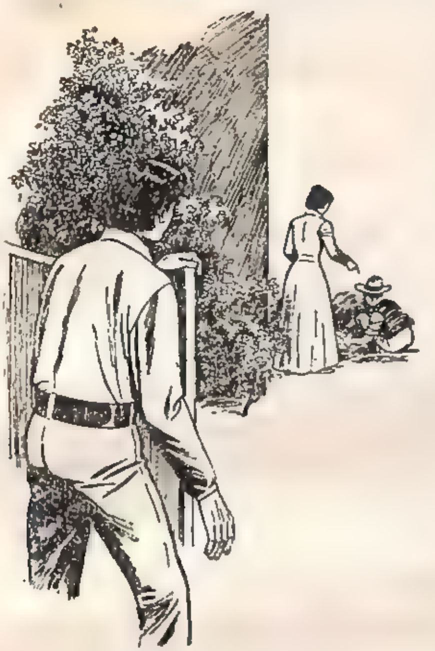

গেট ঠেলে ঢুকল ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল। ওর চোখে জল দেখলে মাও অস্থির হয়ে পড়বে।

বাবা বাড়ি নেই। রাজপ্রাসাদে গেছেন সেই ভোরবেলা। কি সব জরুরী পরামর্শ আছে রাজার সঙ্গে। যাক—বাঁচা গেল। এখন খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দেবে।

কিন্তু ফ্রান্সিসের কপালে নিশ্চিন্ত ঘুম নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা'র কণ্ঠস্বর শুনল—বেচারা ঘুমুচ্ছে—এখন আর তুলে—

—হুঁ। বাবার সেই গম্ভীর গলা শোনা গেল।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের বাবা এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন ভুরু কুঁচকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানার ওপরে উঠে বসল। বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমতা-আমতা করে বলতে লাগল—ম্-মানে ইয়ে হয়েছে—

—পুরো এক মাস এইখান থেকে কোথাও বেরোবে না।

—বেশ—ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না।

—পালিয়েছিলে কেন ?

—বললে তো আর যেতে দিতে না।

—হুঁ !

—বিশ্বাস কর বাবা, সোনার ঘণ্টা সত্যিই আছে।

—মুণ্ডু।

—আমি সোনার ঘণ্টার বাজনার শব্দ শুনেছি।

—এখন ঘরে বসেই সোনার ঘণ্টার বাজনা শোন।

—একটা জাহাজ পেলেই আমি—

—আবার ! বাবা হেঁকে উঠলেন ।

ফ্রান্সিস চুপ করে গেল । ফ্রান্সিসের বাবা দরজার দিকে পা বাড়ালেন । তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—এদিকে এসো ।

ফ্রান্সিস ভয়ে-ভয়ে বিছানা থেকে নেমে বাবার কাছে গেল ।

—কাছে এসো ।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগোল । হঠাৎ বাবা তাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । কয়েক মুহূর্ত । ফ্রান্সিস বুঝল বাবার শরীর আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠছে । হঠাৎ ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিয়ে ওর বাবা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন । ফ্রান্সিস দেখল, বাবা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন ।

বেশ কিছুদিন গেল । ফ্রান্সিস আবার সেই আগের মতই শক্তি ফিরে পেয়েছে—দৃপ্ত, সতেজ । কিন্তু মনে শান্তি নেই । এও তো আর এক রকমের বন্দী জীবন । ওর মত দুরন্ত ছেলের পক্ষে একটা ঘরে আটকা পড়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার । তবু বাবার অজান্তে মা ওকে বাগানে যেতে দেয়, গেট-এ গিয়েও দাঁড়ায় কখনো-কখনো কিন্তু বাড়ীর বাইরে যাবার উপায় নেই । মা'র কড়া নজর । বন্ধু-বান্ধবেরা দল বেঁধে আসে । ফ্রান্সিসের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না । বন্ধুরা সব অবাক হয়ে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনে । ফ্রান্সিস বলে—ভাই তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও, তা'হলে সোনার ঘণ্টা আমার হাতের মুঠোয় ।

ওরা তো সবাই ভাইকিং । সাহসে, শক্তিতে ওরাও তো কিছু কম যায় না ; ওরা হই-চই করে ওঠে—আমরা যাব । ফ্রান্সিস ঠোঁট আঙ্গুল ঠেকিয়ে ওদের শান্ত হতে ইঙ্গিত করে । মা টের পেলে অনর্থ করবে ।

ফ্রান্সিসের নিকট বন্ধু হ্যারি । কিন্তু সে চেঁচামেচিতে যোগ দেয় না । সে বরাবরই ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান । সে শুধু বলে—আগে একটা জাহাজের বন্দোবস্ত করো—আমাদের নিজেদের জাহাজ—তারপর কার কত উৎসাহ দেখা যাবে ।

আবার চেঁচামেচি শুরু হয় । মা ঘরে ঢোকে । বলল—কি ব্যাপার ?

সবাই চুপ করে যায় । মা সবই আন্দাজ করতে পারে । তাই ফ্রান্সিসের ছোট ভাইটাকে পাঠিয়ে দেয় । সে এসে ওদের আড্ডায় বসে থাকে । ব্যস্—আর কিছু বলবার নেই । ওরা যা বলবে ঠিক ফ্রান্সিসের মা'র কানে পৌঁছে যাবে । সব মাটি তা'হলে—

একা-একা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে দিন কাটতে চায় না । সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জন, উত্তাল ঢেউ তাকে প্রতিনিয়ত ডাকে । আবার কবে সমুদ্রে যাবে—বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে, ফ্রান্সিস শুধু ভাবে আর ভাবে । বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করবে তার ও উপায় নেই । মা'র কড়া নজর । অগত্যা একটা উপায় বের করতে হল । রাত্রে মা একবার এসে দেখে যায়, ছেলে ঘুমোল কিনা । ফ্রান্সিস সেদিন ঘুমের ভান করে পড়ে রইল । মা নিশ্চিন্তমনে ঘর থেকে চলে যেতেই ফ্রান্সিস জানালা খুলে মোটা লতাগাছটা বেয়ে নিচে বাগানে নেমে এল । তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায় ।

বন্ধুদের ডেকে পাঠাতে একটু সময় গেল । ততক্ষণ ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে

একটা পোড়ো বাড়িতে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল । একজন-দু'জন করে সবাই এল । সোনার ঘণ্টা আনতে যাবে, এই উত্তেজনায় হই-চই শুরু করে দিল । ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল । গোলমাল একটু কমলে ফ্রান্সিস বলতে শুরু করল—ভাই সব, শুধু উৎসাহকে সম্বল করে কোন কাজ হয় না । ধৈর্য চাই, চিন্তা চাই । দীর্ঘদিন ধরে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের । নিজেদের দাঁড় বাইতে হবে, পাল খাটাতে হবে, ডেক পরিষ্কার করতে হবে, আবার ঝড়ের সঙ্গে লড়তে হবে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা সামলাতে হবে । কি, পারবে তোমরা ?

—আমরা পারবো—সবাই সমস্বরে বলে উঠল ।

—হয়তো আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম, খাদ্য ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল—তখন কিন্তু অধৈর্য হবে না—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করাও চলবে না । মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুক দিয়ে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে । কি পারবে ?

—পারবো । আবার সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই ।

কয়েক রাত এই রকম সভারও পরামর্শ হল । কি ভাবে একটা জাহাজ জোগাড় করা যায় ? ফ্রান্সিস দু'-একবার বাবাকে বলবার চেষ্টা করেছে—যদি উনি রাজার কাছ থেকে একটা জাহাজ আদায় করে দেন । কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন ।

হ্যারিই প্রথমে বুদ্ধিটা দিল । হ্যারি কথা বলে কম, কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান । সে বলল—আমরা রাজার জাহাজ চুরি করব ।

—জাহাজ চুরি ? সবাই অবাক্ ।

—হ্যাঁ, রাজা যখন চাইলে জাহাজ দেবেন না, তখন চুরি ছাড়া উপায় কি ।

—কিন্তু—ফ্রান্সিস দ্বিধাগ্রস্ত হল ।

—আমরা তো সমুদ্রে ভেসে পড়ব, রাজা আমাদের ধরতে পারলে তো ! তাছাড়া—যদি সত্যিই সোনার ঘণ্টা আনতে পারি—তখন—

—ঠিক—ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল । সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হল ।

* * *

গভীর রাত্রি । বন্দরের এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে । মশালের আলো জলে কাঁপছে । রাজার সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিচ্ছে । অন্ধকারে নোঙর করা রয়েছে রাজার জাহাজগুলো ।

প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ফ্রান্সিস আর তার পঁয়ত্রিশজন বন্ধু জাহাজগুলোর দিকে এগোতে লাগল । পাথরের ঢিবি, খড়ের গাদা, স্তূপীকৃত কাঠের বাক্সের আড়ালে-আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা । হাতের কাছে সব চাইতে বড় যে জাহাজটা, সেটাতেই নিঃশব্দে উঠতে লাগল সবাই । যে সব প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল, তারা এতগুলো লোককে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে জাহাজে উঠতে দেখে অবাক্ হয়ে গেল । ওরা খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই ফ্রান্সিসের বন্ধুরা একে-একে সবাইকে কাবু করে ফেলল । তারপর জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল । জাহাজটা কূল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে ভেসে চলল ।

এদিকে হয়েছে কি, সেই জাহাজে রাজার নৌবাহিনীর সেনাপতি একটা গোপন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে । সেনাপতিই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা । যাতে আরো সৈন্য তার দলে এসে যোগ দেয়, গোপন সভায় সেটাই ছিল উদ্দেশ্য । তারা আলোচনায় এত

তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জানতেও পারল না কখন জাহাজটা চুরি গেছে, আর জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জাহাজটা দুলে-দুলে উঠতে লাগল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা তো অবাক। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে এল কি করে? ওরা সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল কি ব্যাপার দেখতে। ওরা উঠে আসছে বুঝতে পেরে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা সব লুকিয়ে পড়ল। সেনাপতি তার দলবল নিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই সবাই লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। সেনাপতি খুব বুদ্ধিমান। বুঝল, এখন ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। লোকদের ইঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—সেনাপতি মশাই, আপনাকেও আমরা সঙ্গে পাব, এটা ভাবতেই পারিনি। যাকগে, মিছিমিছি তরোয়াল খুলবেন না, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দলে ভারি। এবার আপনাদের তরোয়ালগুলো দিয়ে দিন।

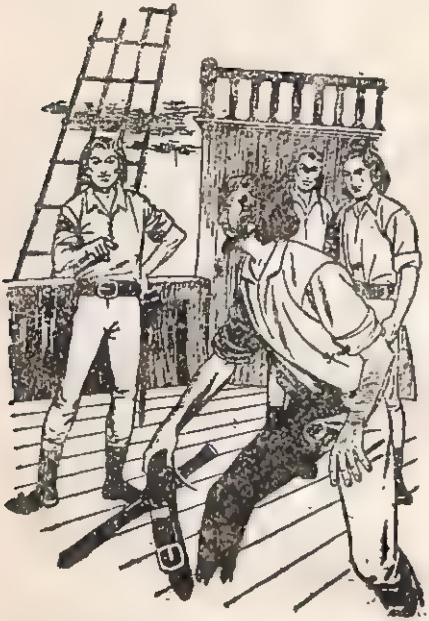

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়ালশুদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল।

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়াল সুদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল। সেনাপতির দেখাদেখি তার দলের সৈন্যরাও তরোয়াল খুলে ডেক-এর ওপর রাখল। ফ্রান্সিসের দলের একজন তরোয়ালগুলো নিয়ে চলে গেল। সেনাপতি গম্ভীরমুখে বলল—তোমরা রাজার জাহাজ চুরি করেছ—এজন্যে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

—সে আমরা বুঝবো—ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমরা জাহাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

—সোনার ঘণ্টা আনতে—

সেনাপতি মুখ বেঁকিয়ে হাসল—ওটা একটা ছেলে ভোলানো গল্প।

—দেখাই যাক না। ফ্রান্সিস হাসল।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। পালগুলো ফুলে উঠেছে। হাওয়ার তোড়ে। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খুব খুশী। দাঁড় টানতে হচ্ছে না। সমুদ্রও শান্ত। খুব সুলক্ষণ। নির্বিঘ্নেই ওঁরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে।

ফ্রান্সিস কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার মনে শান্তি নেই! সারাদিন যায় জাহাজের কাজকর্ম তদারকি করতে। তারপর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, ফ্রান্সিস তখন একা-একা ডেক-এর ওপর পায়চারি করে। কখনও বা রেলিং ধরে দূর অন্ধকার

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। একমাত্র চিন্তা—কবে এই যাত্রা শেষ হবে—সেই দ্বীপে গিয়ে পেঁছিবে। মাঝে-মাঝে হ্যারি বিছানা থেকে উঠে আসে। ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—এবার শুয়ে পড়গে যাও।

—হ্যারি—ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলে—তুমি তো জানো সোনার ঘণ্টা আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন। যতদিন না সেটার হদিশ পাচ্ছি, ততদিন আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারব না।

—তবু—শরীরটাকে তো বিশ্রাম দেবে!

—হ্যাঁ, বিশ্রাম। ফ্রান্সিস হাসল—চল।

* * *

কতদিন হয়ে গেল। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। এর মধ্যে তিনবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়েছিল। প্রথম দু'বারের ঝড় ওদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু শেষ ঝড়টা এসেছিল হঠাৎ। পাল নামাতে-নামাতে দু'টো পাল ফেঁসে গিয়েছিল। পালের দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে সব মেরামত করতে হয়েছে। কিন্তু সেলাই করা পালে তো ভরসা করা যায় না। জোর হাওয়ার মুখে আবার ফেঁসে যেতে পারে।

জাহাজ তখন ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। কোন বন্দরে জাহাজ থামিয়ে পালটা পালটে নিতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হল না। কেউ আর দেরি করতে চায় না। কতদিন হয়ে গেল দেশ-বাড়ি ছেড়ে এসেছে। ফেরার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ফ্রান্সিস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—পালটা পাল্‌টাতেই হবে। যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাদের পড়তে হবে, সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণাই নেই। শুধু ফ্রান্সিসই জানে তার ভয়াবহতা—সেই মাথার ওপর উন্মত্ত ঝড় আর নীচে ডুবো পাহাড়ের বিশ্বাসঘাতকতা। সে সব সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। ফেঁসে যাওয়া পাল নিয়ে সেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা চলবে না। শেষে রাজি হল সবাই। প্রায় সকলেরই ধারণা হল, ফ্রান্সিস বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখছে। এই নিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জনও চলল।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা এতদিন চুপ করে সব দেখছিল। ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে তার সঙ্গীদের ক্ষেপিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিল। এবার সুযোগ পাওয়া গেল! এর মধ্যে ফ্রান্সিসের একটা হুকুমও সবাই ভালো মনে নিল না। ফ্রান্সিসেরই তিনজন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্যে বারবার ফ্রান্সিসকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস অটল। অসম্ভব—ফিরে যাওয়া চলবে না। সে সোজা বলল—ওসব ভাবনা মন থেকে তাড়াও। কাজ শেষ না করে কেউ ফেরার কথা মুখেও এনো না। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা। ওদের প্যানপ্যানানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। তাই যে ছোট্ট বন্দরটায় পালটা পাল্টাবার জন্যে জাহাজটা থামল, ফ্রান্সিস ওদের সেখানে জোর করে নামিয়ে দিল। অন্য জাহাজে করে ওরা যেন দেশে ফিরে যায়। এমনিতেই ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাটা তাতে আরো একটু ইন্ধন জোগাল। সেই ছোট্ট বন্দরে পালটা বদলে, জাহাজের টুকিটাকি মেরামত সেরে নিয়ে তাদের যাত্রা আবার শুরু হল।

দিন যায়, রাত যায়। কিন্তু কোথায় সেই দ্বীপ? কোথায় সেই সোনার ঘণ্টা? সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়তে লাগল। এ কোথায় চলেছি আমরা? গল্পের সোনার ঘণ্টার অস্তিত্ব আছে কি? না কি সবটাই ফ্রান্সিসের উদ্ভট কল্পনা? সেনাপতি তার দলের

লোকেরা এতদিনে সুযোগ গেল। তারা গোপনে সবাইকে বোঝাতে লাগল—'ফ্রান্সিস উন্মাদ। একটা ছেলে ভুলানো গল্পকে সত্যি ভেবে নিয়েছে। আর দিন নেই, রাত নেই, সেই কথা ভাবতে-ভাবতে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ও পাগল বলে আমরা তো পাগল হতে পারি না? দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়েছি। কোঁথায় চলেছি, তার ঠিকানা নেই। কবে দেশে ফিরব, অথবা কেউ ফিরতে পারব কি না, তাও জানি না। একটা কাল্পনিক জিনিসের জন্যে আমরা এ ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করতে যাব কেন?'

কিন্তু উপায় কি? সবাই মুষড়ে পড়ল। সেনাপতিও ধীরে-ধীরে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে লাগল।

এর মধ্যে আর এক বিপদ। জাহাজে খাদ্যাভাব দেখা দিল। মজুত জলে তখনও টান পড়েনি। কিন্তু কম খেয়ে আর কতদিন চলে? খাদ্য যা আছে, তাতে আর কিছুদিন মাত্র চলবে। তারপর? সেনাপতি বুদ্ধি দিল সবাইকে—এখনও সময় আছে। চল আমরা ফিরে যাই। এই সবকিছুর মূল হচ্ছে ফ্রান্সিস। তার নেতৃত্ব অস্বীকার করো। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওকে জলে ফেলে দাও। তারপর জাহাজ ঘোরাও দেশের দিকে।

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। শুধু হ্যারি সবকিছু আঁচ করে বিপদ গুনলো।

ফ্রান্সিস কিন্তু এতসব ব্যাপার কিছুই আঁচ করতে পারেনি। ওর তো একটাই চিন্তা যে করেই হোক সেই দ্বীপে পৌঁছতে হবে। ওর বন্ধুরা কেমন যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। একমাত্র হ্যারিই আগের মত ফ্রান্সিসের সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। তবে তার প্রশ্নেও সংশয়ের আভাস ফুটে ওঠে।

গভীর রাত্রিরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল দু'জনে। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল—ফ্রান্সিস তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, সোনার ঘণ্টা বলে কিছু আছে।

—তোমার মনে সন্দেহ জাগছে? ফ্রান্সিস একটু হাসে।

—সে কথা নয়। এতগুলো লোক একমাত্র তোমার ওপর ভরসা করেই যাচ্ছে।

—হ্যারি আমি জাহাজ ছাড়ার সময়ই বলেছিলাম—যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সকলে জীবনের দায়িত্ব আমার। কাউকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাই আমি দেব।

—তোমাকে আমি ভালো করেই জানি ফ্রান্সিস—কথার খেলাপ তুমি করবে না! কিন্তু হাজার হোক মানুষের মন তো —

—আমি বুঝি হ্যারি! দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি—আত্মীয়-স্বজন, বাড়ীঘরের জন্যে মন খারাপ করবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে সব সময় পিছুটান অস্বীকার করতে হয়। নইলে আমরা এগোতেই পারব না।

—আচ্ছা ফ্রান্সিস, তুমি আমাদের যা-যা বলেছ, সে সব তোমার কল্পনা নয় তো?

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। কাঁধের কাছে জামাটা একটানে খুলে ফেলল। ও তরোয়ালের কোপের সেই গভীর ক্ষতটা দেখিয়ে বলল—এটাও কি কল্পনা হ্যারি?

হ্যারি চুপ করে গেল। বলতে সাহস করল না যে, ওর বন্ধুরা সবাই ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস কথাটা শুনলে হয়তো ক্ষেপে গিয়ে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ নিল একদিন। সেদিন সকাল থেকেই সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা গোপনে ফ্রান্সিসের কয়েকজন বন্ধুকে বলল—'জানো, আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্রান্সিস নিজেই জানে না, জাহাজ এখন কোনদিকে, কোথায় চলেছে।

এমনিতেই সকলের মনে অসন্তোষ জড়ো হয়েছিল। এই মিথ্যা রটনা যেন শুকনো বারুদের স্তূপে আগুন দিল। মুহূর্তে খবরটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেনাপতির নেতৃত্বে গোপন সভা বসল। সবাই একমত হলো সেনাপতিই হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফ্রান্সিসের হুকুম আর চলবে না। হ্যারিও সভার ব্যাপারটা আঁচ করে সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে উঠল। কিন্তু পারল না। তার আগেই কয়েকজন মিলে তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘরে কয়েদী করে রেখে দিল। ফ্রান্সিস যাতে আগে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে, তার জন্যে সবাই সাবধান হল।

* * *

তখন গভীর রাত। ফ্রান্সিস একা-একা ডেকে পায়চারি করছে! পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। ডেক-এর ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের হাতছানি, মাথায় জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। ফ্রান্সিসের কিন্তু কোনদিকে চোখ নেই। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে জ্যোৎস্নাধোয়া দিগন্তের দিকে।

হঠাৎ পেছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। ও ভেবেছিল হ্যারি এসেছে বোধহয়। কিন্তু না। হ্যারি নয়—সেনাপতি। পেছনে তার দলের কয়েকজন। ফ্রান্সিসের আশ্চর্য হওয়ার তখনও বাকি ছিল। নীচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে সবাই দল বেঁধে উঠে আসছে ডেক-এ। ব্যাপারটা কি?

সেনাপতি এগিয়ে এসে ডাকল—ফ্রান্সিস?

—হুঁ।

—আমরা কেন উঠে এসেছি বুঝতে পেরেছ?

—না।

—তোমাকে একটা কথা জানাতে।

—কি কথা?

—এই জাহাজ তোমার হুকুমে আর চলবে না।

—কেন?

—তোমাকে কিন্তু কেউ আর বিশ্বাস করে না।

—তা'হলে কাকে বিশ্বাস করে?

—আমাকে। এই জাহাজের দায়িত্ব এখন আমার।

ফ্রান্সিসের কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ষড়যন্ত্রের মূলে সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা। তারাই ওর বন্ধুদের মন বিষিয়ে তুলেছে। ফ্রান্সিস এবার সকলের দিকে তাকাল, চীৎকার করে বলল—ভাইসব, আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা?

কেউ কোন কথা বলল না ফ্রান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ-কেউ মুখ ফেরাল। কেউ-কেউ মাথা নিচু করল। আশ্চর্য! হ্যারি কোথায়?

ফ্রান্সিস বুঝল, তা'হলে ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর দুঃখে তার বুক ভেঙে যেতে লাগল। একটা স্বপ্নকে কেন্দ্র করে এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। ফ্রান্সিস অশ্রু-রুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, 'ভাইসব, অতি নগণ্যসংখ্যক হলেও পৃথিবীর এমন কিছু মানুষ আছে, ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে না। বাইরের পৃথিবীতে জীবনমৃত্যুর যে খেলা চলছে—নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেই খেলায় মাতে সে। এর মধ্যেই সে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। আমিও তেমনি একজন মানুষ'—ফ্রান্সিস একটু থামল। তারপর বলতে লাগল, 'তোমাদের কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, সোনার ঘণ্টা খুঁজে বের করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য কি ? উত্তর খুবই সহজ—আমি বড়লোক হতে চাই ? কিন্তু তোমরা আমার বন্ধু—ভালো করেই জানো আমাদের পরিবার যথেষ্ট বিত্তশালী। তবে কেন এত আগ্রহ ? কেন এই অভিযান ? ভাইসব, উদ্দেশ্য আমার একটাই। ছেলেবেলা থেকে যে গল্প শুনে আসছি। কত রাতের স্বপ্নে দেখেছি সেই সোনার ঘণ্টা খুঁজে বের করব। তারপর দেশে নিয়ে যাব, আমাদের রাজাকে উপহার দেব। ব্যস্—আমার কাজ শেষ। এর জন্যে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিপর্যয় এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও আমি দ্বিধাবোধ করব না।'

ফ্রান্সিস একটু থেমে আবার বলতে লাগল—'তোমরা সেনাপতিকে ক্যাপ্টেন বলে মেনে নিয়েছো। ভালো কথা। জাহাজের মুখ ঘোরাও দেশের দিকে। ফিরে গিয়ে ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাওগে। কিন্তু আমি ফিরে যাব না। ফেরার পথে প্রথমে যে বন্দরটা পাব, আমি সেখানেই নেমে যাব। জাহাজ জোগাড় করে আবার আসবো। আমাকে যদি সারাজীবন ধরে সোনার ঘণ্টার জন্যে আসতে হয়, আমি আসব।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ সেনাপতি চেঁচিয়ে বলল—এসব বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার। জাহাজের মুখ ঘোরাও।

ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। দেশে ফিরে যাবে, এই আনন্দে সবাই চীৎকার করে উঠল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেনি, চাঁদের আলো ম্লান হয়ে গেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের মত কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। বাতাস থেমে গেছে। জাহাজের গতিও কমে এসেছে। ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলল—'এত কুয়াশা এল কোথেকে ?'

কথাটা কারো-কারো কানে গেল। তারা কুয়াশা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য ! এত কুয়াশা ? এই অসময়ে ? গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুয়াশার সেই আস্তরণের দিকে।

ফ্রান্সিস রেলিঙে ভর দিয়ে হাতে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সেও লক্ষ্য করেনি চারিদিকের পরিবেশে এই পালটে যাওয়ার ঘটনাটা। হঠাৎ ওর কানে গেল সকলের ভীত গুঞ্জন। ফ্রান্সিস মুখ তুলল। এ কি ! চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক কুয়াশার ঘন-ঘন আস্তরণ ঢেকে দিয়েছে সমুদ্র আকাশ। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল— ভাইসব আমরা এসে গেছি। এক মুহূর্ত নষ্ট করবার মত সময় নেই। দাঁড়ে হাত লাগাও। সামনেই প্রচণ্ড ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বাধা। সবাই তৈরী হও।

কিন্তু সেই ভীড়ে কোন চাঞ্চল্য জাগল না। সবাই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

হঠাৎ সেনাপতি চীৎকার করে উঠল—সব ধাপ্পাবাজি।

ফ্রান্সিস সেনাপতির দিকে একবার তাকাল। তারপর দু'হাত তুলে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল—আমাকে বিশ্বাস কর। আমার বন্ধুত্বের মর্যাদা দাও, সবাই তৈরি হও আর দেরি করো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা সোনার ঘণ্টার বাজনার শব্দ শুনতে পাবে।

—পাগলের প্রলাপ—সেনাপতি গলা জড়িয়ে বলল।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না—ফ্রান্সিস তবু বলে যেতে লাগল—পাল নামাও, দাঁড়ে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস আর বলতে পারল না। পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরেছে। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। পারলো না। সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়ালের চাপ বেড়ে গেল। শুনল সেনাপতি দাঁত চাপা স্বরে বলছে—আর একটা কথা বলেছ তো, জন্মের মত তোমার কথা বলা থামিয়ে দেব।

সেনাপতির কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। উত্তাল ঢেউ জাহাজে রেলিঙের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ডেকে আছড়ে পড়ল। সেনাপতি কোথায় ছিটকে পড়ল। অন্য সকলেও এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। শুরু হল জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনি। ডেকে দাঁড়ায় তখন কার সাধ্য। ঠিক তখনই ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠল সোনার ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ—ঢং—ঢং—ঢং।

ডেকে এখানে-ওখানে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলো উৎকর্ণ হয়ে শুনল সেই ঘণ্টার শব্দ। এই ঘণ্টার শব্দ যেন মন্ত্রের কাজ করল। সোনার ঘণ্টা—এত কাছে। জাতে ভাইকিং ওরা। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক। ঝড় প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। সমুদ্রও উন্মত্ত। কিন্তু ওরাও জানে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে। ওরা আর কারো নির্দেশের অপেক্ষা করল না। একদল গেল দাঁড় বাইতে, আর একদল গেল মাস্তুলের দিকে পাল নামাতে।

এদিকে ফ্রান্সিস ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলেই ছুটেছিল মাস্তুলের দিকে। ওর উদ্দেশ্য মাস্তুলের মাথায় উঠে দেখা ঘণ্টার শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজের ভীষণ দুলুনি উপেক্ষা করে মাস্তুল বেয়ে উঠতে লাগল। একেবারে মাথায় উঠে প্রাণপণ শক্তিতে মাস্তুলটা আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর যেদিক থেকে ঘণ্টার শব্দ আসছে, সেইদিকে তাকাল। ঝড়-বৃষ্টির আবছা আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখল, দু'টো পাহাড়ের মত পাথুরে দ্বীপ। মাঝখানে সমুদ্রের জল বিস্তৃত। আশ্চর্য! সেখানে সমুদ্র শান্ত। সেই সমুদ্রের মধ্যে দূরে একটা নিঃসঙ্গী পাহাড়ের মত দ্বীপ। পাথুরে দ্বীপ নয়। সবুজ ঘাস আছে দ্বীপটার গায়ে। তারমাথায় একটা সাদা রং-এর মন্দির। শব্দটা আসছে সেই দিক থেকেই। ফ্রান্সিস তার কিছুই দেখতে পেল না। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে গেল। মাস্তুল থেকে প্রায় ছিটকে পড়ার মত অবস্থা। ও তাড়াতাড়ি মাস্তুল বেয়ে নীচে নামতে লাগল। ডেকে পা দেবার আগেই দু'টো পাল খাটাবার কাঠ সশব্দে ভেঙে পড়ল। ডেকে কয়েকজন চীৎকার করে উঠল। কি হল, তা আর তাকিয়ে দেখবার অবকাশ নেই।

ফ্রান্সিস ডেকে নেমেই ছুটল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে চলে এল দাঁড় টানার লম্বা ঘরটায়। সারি-সারি বেঞ্চগুলোর দিকে তাকাল। দেখলো, সবাই প্রাণপণে দাঁড় টানছে।

জাহাজের দুলুনিতে ভালোভাবে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস সেই দুলুনির মধ্যে কোনরকমে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল—ভাইসব, সামনেই ডুবো পাহাড়। আমরা আর সামনের দিকে যাব না। জাহাজ পিছিয়ে আনতে হবে। ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়াতে হবে। তারপর ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজ যে দিকে যায় যাক।

সবাই দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে ফ্রান্সিসের কথা শুনল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ফ্রান্সিস যে সত্য কথাই বলেছে, এ বিষয়ে কারও মনে আর সন্দেহ রইল না। এবার সবাই উল্টোদিকে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ পিছিয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের কয়েকটা প্রচণ্ড ধাক্কায় অনেকটা পিছিয়ে এল। কিন্তু ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়াতে পারলো না। খুব জোরে ধাক্কা লাগল না তাই রক্ষে। পেছনের হালটা মড়-মড় করে ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে পেছনের রেলিঙের কাছে অনেকটা জায়গা ভেঙে খোঁদল হয়ে গেল। তবু খোঁদলটা খুব উঁচুতে হল বলে বেশী জল ঢুকতে পারলো না। জাহাজ ডোবার ভয়ও রইল না। তারপর ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কলার মোচার মত নাচতে-নাচতে জাহাজ কোনদিকে যে চললো, তা কেউ বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস ততক্ষণে জাহাজের খোলার ঘরগুলো খুঁজতে আরম্ভ করেছে। এ ঘরের দরজায় ও ঘরের কাঠের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে-খেতে ও হ্যারিকে খুঁজতে লাগল। একটা বন্ধ ঘরের দরজায় ফ্রান্সিস জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকল—'হ্যারি!'

ভেতর থেকে হ্যারির উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—'কে? ফ্রান্সিস!'

ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। কিন্তু দরজা ভাঙল না। মরচে ধরা কড়াটা একটু আলগা হল। তালাটা ঠিকই ঝুলতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে একটা হাতলভাঙা হাতুড়ি নজরে পড়ল। সেটা এনে মরচে ধরা কড়াটায় দমাদ্দম ঠুকতে লাগল। কয়েকটা ঘা পড়তেই কড়াটা দুমড়ে ভেঙে গেল। খোলা দরজা দিয়ে হ্যারি কোনরকমে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস দ্রুত বলল—এখন কথা বলার সময় নেই, ডেকে চলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ফ্রান্সিস বুঝলো জাহাজটা আর তেমন দুলছে না। ডেকে উঠে দেখলো, জল-ঝড় তেমন নেই আর। তবে সমুদ্র আকাশে এখনও পাতলা কুয়াশায় আস্তরণ রয়েছে। হাওয়ায় কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হলোও তাই। কুয়াশা উড়ে গেল। আকাশে দিগন্তের দিকে হেলে পড়া পাণ্ডুর চাঁদটা দেখা গেল। রাত শেষ হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি!

হ্যারি এগিয়ে আসতে ফ্রান্সিস বললো—চলো, হালের অবস্থাটা একবার দেখে আসি।

দেখা গেল, হালটা একেবারেই ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে জাহাজের অনেকটা জায়গা ভেঙে হাঁ হয়ে গেছে। সব দেখে-শুনে ফ্রান্সিস বললো—বে-হাল জাহাজ, কোথায় যে চলছে, তা ঈশ্বরই জানে।

—সে সব কাল ভাবা যাবে। এখন ঘুমিয়ে নেবে চল। হ্যারি তাগাদা দিলো।

—হ্যাঁ চল। খুব পরিশ্রান্ত আমি। পা টলছে, দাঁড়াতে পারছি না। পরদিন ঘুম ভেঙে যেতেই ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠল। সকাল হয়ে গেছে। সবাই অঘোরে

ঘুমুচ্ছে। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ডেকের দিকে। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলো, আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রও শান্ত। সাদা রংয়ের সামুদ্রিক পাখিগুলো উড়ছে। তীক্ষ্ণস্বরে ডাকছে। কিন্তু এ কোথায় এলাম? একটা ধু-ধু মরুভূমির মত জায়গায় জাহাজ কাত হয়ে বালিতে আটকে আছে! এখন আর ভাববার সময় নেই। সবাইকে ডেকে তুলতে হবে। জাহাজ মেরামত করতে হবে। তারপর সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে আস্তে পেটে ঘুষি মেরে, কারো পিঠে চাপড় দিয়ে সে গলা চড়িয়ে বলল—ওঠ সব, ডেক-এ চল।

সবাই একে-একে উঠে পড়ল। উপরে ডেকে এসে দাঁড়াল। ডাঙার ধু-ধু বালির দিকে তাকিয়ে বোধহয় ভাবতে লাগল—কোথায় এসে ঠেকলাম? ওদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—সবাই কথা বলতে লাগল। সবার মুখেই একই প্রশ্ন, এলাম?

ফ্রান্সিস ডেকে এসে দাঁড়াল। সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল,—ভাইসব, জাহাজ কোথায় এসে ঠেকেছে, আমরা কেউই বলতে পারব না। ওসব ভাবনা পরে ভাবা যাবে। যাবে। এখন নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। একদল চলে যাও রসুই ঘরে—রান্নার বন্দোবস্ত করো। আর সবাই জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাও।

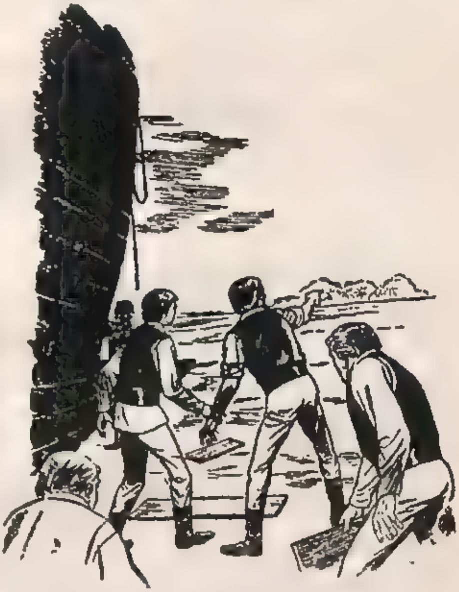

লোকটা আঙুল তুলে সেই মরুভূমির মত ধু-ধু বালির দিগন্ত দেখাল।

ফ্রান্সিস সেনাপতি আর তার দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—আপনাদেরও হাত লাগাতে হবে।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা মুখ গোমড়া করে সকলের সঙ্গে চলল! ফ্রান্সিস আবার তার বন্ধুদের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, এটা সেনাপতির দলের কাছে ভাল লাগল না। ওরা ধান্ধায় রইল, কি করে ফ্রান্সিসকে অপদস্থ করা যায়।

জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা নামানো হল। হালের জায়গাটায় যেখানে খোঁদল হয়ে গেছে, সেই জায়গাটা জোড়া দেবার কাজ চলল। নির্জন সমুদ্রতীর মুখর হয়ে উঠল ওদের হাঁক-ডাক কথাবার্তায়।

পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে। হঠাৎ কে যে বলে উঠল—ওটা কি রে? তার কণ্ঠে বিস্ময়। তার কথা যাদের কানে গেল, তারা ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল। কি ব্যাপার? লোকটা

আঙ্গুল তুলে সেই মরুভূমির মত ধু-ধু বালির দিগন্ত দেখাল। সত্যিই তো। দিগন্ত রেখার একটু উঁচুতে কি যেন চিকচিক করছে, একটা, দুটো, তিনটে, অনেকগুলো। চিকচিক করছে যে জিনিসগুলো, সেগুলো চলন্ত। এদিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে সবাই সেদিকে তাকাল। সকলের চোখমুখেই বিস্ময়। ওগলো কি?

সবাই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে ঝোলানো দাঁড় বেয়ে জাহাজে পড়ল। রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত রেখার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে খুব নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল। একটু পরে নিচের দিকে তাকিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল—একদল সৈন্য আসছে কালো ঘোড়ায় চেপে। ওদের পরণেও কালো পোশাক। ওদের গলায় লকেটের মত কিছু ঝুলছে। লকেটে সূর্যের আলো পড়েছে, তাই চিকচিক করছে। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আর সবাইও এতক্ষণে দেখতে পেল, একদল অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে বালির ঝড় তুলে ওদের দিকেই ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস দাঁড় বেয়ে নিচে নেমে এল। এখন কি করা? সকলেই ফ্রান্সিসের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে গম্ভীরভাবে চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে চীৎকার করে বললো—ওরা লড়তে চাইলে আমরাও লড়ব।

সবাই সমস্বরে হই-হই করে উঠল। এবার অস্ত্র সংগ্রহ। সেনাপতি আর তার দলের লোকদের তরবারিগুলো জাহাজ থেকে আনা হল। তাছাড়া যাদের তরবারি ছিল, তারাও সেগুলো নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সেনাপতি আর দলের লোকদের তরবারিগুলো বেছে কয়েকজনের হাতে দিলো। বাদ-বাকীরা হাতের কাছে যে-যা পেয়ে জোগাড় করে নিয়ে এল। ভাঙা দাঁড়, লোহার শেকল, কুড়ুল, লোহার বড়-বড় পেরেক, কাঠের খুঁটি—এসব যে যা পেল, হাতে নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াল।

সৈন্যদল ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস হিসেব করে দেখল সৈন্যরা সংখ্যায় ওদের চেয়ে বেশি নয়। সমানই হবে। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—সবাই তৈরি থাকো, কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত কেউ এগিয়ে যাবে না। ওরা ঘোড়ায় যুদ্ধ করবে, কাজেই ওদেরই সুবিধে বেশি। আমাদের প্রথম কাজই হবে, যেভাবে হোক ওদের মাটিতে ফেলে দেওয়া। তাহলেই জিত আমাদের।

সৈন্যদল অনেক কাছে এসে পড়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের।

কালো পোশাক পরনে। গলায় ঝুলছে চকচকে লকেট। আরো কাছে। ফ্রান্সিস ওদের ঘোড়া ছোটানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝল, ওরা বন্ধুত্ব করতে আসছে না। ওদের লক্ষ্য যুদ্ধ। হঠাৎ ফ্রান্সিসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এগোও আক্রমণ করো—

প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। চীৎকার করতে-করতে সবাই ছুটল সৈন্যদলের দিকে।

প্রথম সংঘর্ষেই বেশ কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে বালির ওপর পড়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যেও আহত কয়েকজন। ভাইকিংরা অশ্বারোহী সৈন্যদের পায়ে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিতে লাগাল। ভাঙ্গা দাঁড়, পেরেক, কড়ুল দিয়ে ওদের পেছনে আঘাত করতে লাগল। আরও কিছু সৈন্য বালির ওপর পড়ে গেল। এবার শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। ফ্রান্সিসের বাছাই করা দল নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। সৈন্যরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে

এ'টে উঠতে পারল না। একে-একে সৈন্যরা প্রায় সবাই হয় মারা গেল, নয়তো মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে বালির ওপর শুয়ে-শুয়ে গোঙাতে লাগল। জনা দশেক যারা বেঁচেছিল, ঘোড়ার পিঠে উঠে তারা পালাতে শুরু করল। ভাইকিংরা হই-চই ক'রে তাদের তাড়া করলো। অশ্বারোহী সৈন্যরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল। সবাই আনন্দে চীৎকার করতে লাগল—কেউ নাচতে লাগল, কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরল। যুদ্ধে জয়ের উত্তেজনা স্তিমিত হতে সবাই আবার জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাল। আবার কাজ চললো।

হঠাৎ চিকচিক—বালির দিগন্ত রেখায় আবার লকেটের ঝিকিমিকি। ফ্রান্সিস হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছিল। হ্যারি পেরেক এগিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস!

—কি?

—ওদিকে চেয়ে দেখ।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখলো, দিগন্তরেখার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অজস্র লকেটের ঝিকিমিকি। এতক্ষণে সবাই কাজ ফেলে দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই উত্তেজিত—লড়াই হবে। একটু আগেই একটা লড়াইতে জিতেছে। সেই জয়ের উন্মাদনা এখনও কাটেনি। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল। বালির ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে কালো পোশাকপরা সৈন্যবাহিনী। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে লকেটগুলো। উত্তেজিত ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কারও উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—লড়বো আমরা, পরোয়া কিসের?

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীরভাবে কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল। গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই উৎসুক হলো—ফ্রান্সিস কি বলে?

ফ্রান্সিস হাত থেকে হাতুড়িটা বালির ওপর ফেলে দিল। বলল—না, আমরা লড়াই করব না।

ফ্রান্সিসের এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই মনঃপূত হল না। আবার গুঞ্জন শুরু হল। সেনাপতি তার দলের লোকদের নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে শলাপরামর্শ করছিল। এবার সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল। সেনাপতি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি ভীরু-কাপুরুষ, ভাইকিংদের কলঙ্ক। ভিড়ের মধ্যে কেউ-কেউ চীৎকার করে সেনাপতিকে সমর্থন করল। ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল—আমাকে যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু এতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলতে পারব না।

—লড়তে গেলে প্রাণ নিতেও হবে, দিতেও হবে। তাই বলে কাপুরুষের মত আগে থাকতে হার স্বীকার করে বসে থাকবো?

ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে থাকা সৈন্য-বাহিনীকে দেখাল—আন্দাজ করতে পারেন ওরা সংখ্যায় কত?

—যতই হোক, আমরা লড়ব।

—সাধ করে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনছেন।

—তুমি ভীরু, দুর্বল।

—বেশ আমার বন্ধুরা কি বলে শোনা যাক।

ফ্রান্সিস ভাইকিংদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব, আমি কাপুরুষ নই। তোমরা যদি লড়তে চাও, আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। কিন্তু তোমরা একটু ভাবতে যদি—ওরা আমাদের বন্দী করেও নিয়ে যায়, তবু সময় আর সুযোগ বুঝে আমরা পালাতে পারব। কিন্তু একবার এই লড়াইয়ে নামলে আর পালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই লড়াইতে আমরা কেউ বাঁচবো না।

সবাই ফ্রান্সিসের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। বিপদের গুরুত্বটাও বুঝতে পারল। তবু দ্বন্দ্ব। কাপুরুষের মত হার স্বীকার করব!

ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—তোমরা হয়তো ভাবতে পারো লড়াই না করে হার স্বীকার করা কাপুরুষের কাজ। আমি বলব—না। শুধু কব্জির জোরে লড়াই হয় না, সঙ্গে বুদ্ধির জোরও চাই। আজকে আমরা লড়ব না, কিন্তু পরে লড়তে আমাদের হবেই, শত্রুর দুর্বলতার মুহূর্তে। একেই বলে বুদ্ধির লড়াই।

সবাই চুপ করে রইল। শুধু সেনাপতি গজরাতে লাগল—আমরা ভাইকিং, এভাবে হার স্বীকার করা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করল না। সেনাপতির দলের লোকেরা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে তারা চুপ করে গেল।

সেই কালো পোশাক পরা সৈন্যদল কাছাকাছি এসে ঘোড়ার চলার গতি কমিয়ে দিল। সারবন্দী হয়ে ওরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল! ওদের সেই সারি থেকে দু'জনকে সকলের আগে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—এ কি! সুলতান আর রহমান। তাহলে জাহাজডুবি হয়ে ও যে ভাসতে-ভাসতে এসেছিল, এবার জাহাজটাও সেইখানে এসেই ঠেকেছে।

সুলতান এবং ফ্রান্সিস দু'জনেই দুজনকে দেখতে পেলেন। ফ্রান্সিসের সামনে ঘোড়া থামিয়ে সুলতান ক্রুর হাসি হাসলেন—এই যে, পুরোনো বন্ধু দেখছি।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। সুলতান বললেন—হ্যাঁ ভালো কথা, দুর্গের সেই জানালাটায় গরাদ লাগানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান তরোয়াল খুলে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন সব ক'টাকে বেঁধে নিয়ে চলো।

সৈন্যদল থেকে কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে এল। সবাইকে সারি বেঁধে দাঁড় করাল। জাহাজে যারা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদেরও এনে সেই সারিতে দাঁড় করানো হল। সকলের বাঁধা হাতের ফাঁক দিয়ে একটা লোহার শেকল টেনে নেওয়া হল? শেকলটার দুই মাথা দু'জন অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে রইল। পেছনে চাবুক হাতে একজন অশ্বারোহী সৈন্য চলল। বন্দীরা বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলল। কেউ দল থেকে একটু পেছলেই চাবুকের ঘা পড়তে লাগল।

পায়ের নীচে বালি তেতে উঠেছে। গরম হাওয়া ছুটছে। এর মধ্য দিয়েই বন্দীরা চলল। কেউ-কেউ ভাবল, এই অপমানের চেয়ে লড়াই করা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই। এখন ওরা বন্দী। বন্দীদের নিয়ে সুলতান যখন আমদাদ

শহরে এসে পৌঁছলেন, তখন সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে।

আমদাদ শহরের রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমে গেল। সবাই অবাক হয়ে ভাইকিং বন্দীদের দেখতে লাগল। মরুভূমির ওপর দিয়ে এতটা পথ ওরা হেঁটে এসেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী। শরীর টলছে। অথচ দাঁড়াবার উপায় নেই, বসবার উপায় নেই। অমনি সপাং করে চাবুকের ঘা এসে পড়ছে।

দলের মধ্যে শুধু ফ্রান্সিসই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ও একবারও পিছিয়ে পড়েনি। ওর মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। কারণ বাইরের কোন কিছুই তাকে ছুঁতে পারছে না। ওর মাথায় শুধু চিন্তা আর চিন্তা—কি করে পালানো যাবে। কি করে জাহাজটা মেরামত করে আবার সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা যাবে। এতগুলো মানুষের জীবনের দায়িত্ব তার ওপর, সে নিশ্চিন্ত থাকে কি করে?

সুলতানের প্রাসাদে যখন ওরা পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। প্রাসাদের সামনে চত্বরে একপাশে ঘোড়াশালের কাছে বন্দীদের বসতে বলা হল। সুলতান প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন। রহমান কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে পাঠাল। চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা কি সব পরামর্শ করতে লাগল। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় ফ্রান্সিসের দলের সবাই কাতর হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হ্যারি এমনিতে অসুস্থ ছিল, এখন প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেল।

যে সৈন্য ক'জন ওদের পাহারা দিচ্ছিল, ফ্রান্সিস তাদের একজনকে কাছে ডাকল। সৈন্যটি কাছে এলে ফ্রান্সিস রহমানকে দেখিয়ে বলল—ওকে ডেকে দাও। পাহারাদার ফ্রান্সিসের কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভঙ্গিতে খোলা তরোয়াল হাতে যেমন হেঁটে বেড়াচ্ছিল, তেমনি হেঁটে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলে উঠল—পেয়েছ কি আমাদের? আমরা জন্তু-জানোয়ার? এতদূর পথ চাবুক খেতে-খেতে হেঁটে এসেছি। আমাদের খিদে পায় না, তেষ্টা পায় না?

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হওয়া মাত্র তার দলের লোকেরা সব হই-হই করে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার সৈন্যটা বেশ ঘাবড়ে গেল। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

এখানকার চীৎকার হইচই রহমানের কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। সব শুনে সে তখনি একজন সৈন্যকে সুলতানের কাছে পাঠাল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো—সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সুলতানের হুকুম না হলে কিছুই দেবার উপায় নেই।

—তা'হলে ক্ষুধায় তেষ্টায় আমরা মারা যাই, এই চান আপনারা?

—সুলতান যদি তাই চান, তবে তাই হবে।

ফ্রান্সিসের দলের লোকেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল। শেকলে ঝনঝন শব্দ উঠল। কিন্তু কিছুই করবার নেই। তাদের হাত বাঁধা। শেকলের দুটো মুখ দেয়ালে গাথা। সেই সৈন্যটা ফিরে এল। সুলতান বোধহয় অনুমতি দিয়েছে। রহমান জল আর খাবার আনতে হুকুম দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এল। পিপে ভর্তি জল এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল। চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। শুধু কয়েকজন মিস্ত্রীর হাতুড়ি পেটানোর শব্দে মাঝে-মাঝে ওদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। মিস্ত্রীরা মোটা-মোটা কাঠ পুঁতে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিলো জায়গাটা। এটাই হল ভাইকিংদের বন্দী-

শালা। বন্দীশালা তৈরী হলে সকলের হাত খুলে দেওয়া হল। বাইরে খিলানওয়ালা দরজার পাশেও মিস্ত্রীরা কাজ করছিল। ফ্রান্সিসের দলের লোকেরা কেউ জানতে পারেনি যে, ওখানে মিস্ত্রীরা একটা ফাঁসিকাঠ তৈরী করছিলো।

* * *

রাত্রি গভীর হলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু মিস্ত্রীদের হাতুড়ি ঠোকার শব্দ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। দু'হাতে মাথা রেখে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চিন্তার যেন শেষ নেই। হঠাৎ একজন পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস কে?

কেউ কোন উত্তর না দিতে লোকটা আবার বললো—ফ্রান্সিস কে?

প্রশ্নটা কয়েকজনের কানে যেতে তারা বললো—ফ্রান্সিসকে কেন?

—সুলতান ডেকেছেন।

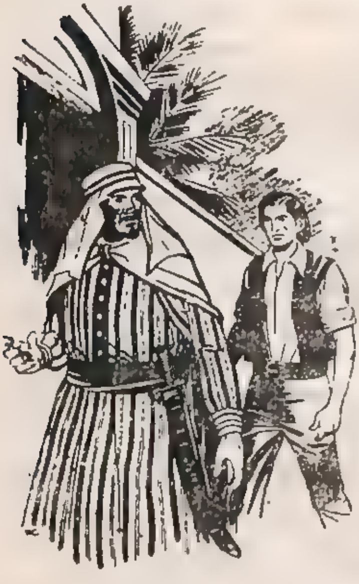

সুলতানের বেগম তোমাকে ডেকেছেন।

এইসব কথাবার্তা কানে যেতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু যাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তারা ফের চেঁচিয়ে বলল—না ফ্রান্সিস যাবে না। সুলতানকে এখানে আসতে বল।

চিৎকার আর কথাবার্তায় অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। তারা সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বললো—না, ফ্রান্সিস একা যাবে না।

এবার কাঁটাতারের দরজার কাছে রহমানের মুখ দেখা গেল। সে হেসে বলল—আমি ফ্রান্সিসকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভয় নেই, ওর কোন ক্ষতি হবে না।

ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত করল। পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার তালা খুলে দিল। ফ্রান্সিস বাইরে এসে রহমানের সামনে এসে বললো—চলুন।

রহমান ওকে সঙ্গে নিয়ে চলল। প্রাসাদে ঢোকার আগে রহমান একবার দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল—সুলতান তোমায় ডাকেননি।

—তবে?

—সুলতানের বেগম তোমাকে ডেকেছেন।

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল। বেগমের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু ফ্রান্সিস বলল—আমার মত একজন বিদেশীকে—

—বেগমের সঙ্গে কথা হোক, তাহলেই জানতে পারবে।

সুসজ্জিত ঘরের পর ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে এল ওরা। অন্দরমহলের জৌলুসে চোখ

ধাঁধিয়ে যায়। মেঝের দেয়ালে জাফরী কাটা জানালায় কি সুন্দর কারুকাজ! একসময়ে সিঁড়ি বেয়ে ওরা একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়াল। পুকুরের চারিদিক শ্বেত পাথরে বাঁধানো। কাঁচের মত শান্ত জল টলটল করছে। পুকুরের ওপাশে বাগানে ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। বাগানের কাছে একটা দোলনা রুপোর শেকলে বাঁধা। দোলনায় কে যেন বসে আছে। রহমান ফিস ফিস করে বলল—বেগমসাহেবা দোলনায় বসে আছেন।

—একা?

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎটা খুবই গোপনীয়।

বেগম-সাহেবার কাছে গিয়ে রহমান আদাব করে সরে এল। ফ্রান্সিসও রহমানের দেখাদেখি আদাব করল। এখানে মশালের ক্ষীণ আলো এসে পেঁাছেছে। তাতে স্পষ্ট বেগম-সাহেবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তবু ফ্রান্সিস বুঝল, বেগম-সাহেবা অপরূপ সুন্দরী। ভুরু দু'টো যেন তুলিতে আঁকা। টানা লাল ঠোঁটের পাশে একটা তিল। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে বেগমের পোশাকের সোনার কারুকাজ করা নকশাগুলো।

—তুমিই ফ্রান্সিস?—সুরেলা গলায় বেগমসাহেবা প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ—ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—তুমি জানো সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে?

—না।

—কিন্তু সুলতান বলেন, তুমি নাকি সব জানো।

—আমি যা জানি সুলতানকে বলেছি।

—সেই মোহর দু'টোর কথাও বলেছো?

—কোন মোহর?—ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল।

—তোমার কাছে যে দু'টো মোহর ছিল।

—তার একটা বিক্রি করে দিয়েছি, আর একটা চুরি হয়ে গেছে।

—তুমি জানো, এ দু'টো মোহরের একটাতে সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়ার, অন্যটাতে ফিরে আসার নকশা খোদাই করা ছিল।

—না, আমি জানতাম না।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। মোহর দু'টো তোমার কাছেই আছে।

ফ্রান্সিসের বেশ রাগ হলো। সে গম্ভীর স্বরে বলল—আমি মিথ্যে কথা বলছি না, বেগম-সাহেবা।

—তোমার মৃত্যু তুমি নিজেই ডেকে আনছো।

—তার মানে?

—দেউড়ির খিলানে এতক্ষণে ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল—তা'হলে আমাকে—

—হ্যাঁ, তোমাকে কাল সকালে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। একবার মনে হলো, বেগমের কাছে সে প্রাণ ভিক্ষা করে। পরক্ষণেই মনে হল, না আমরা ভাইকিং। আমাদের মৃত্যু-ভয় থাকতে নেই।

—আমার বন্ধুদের কি হবে?

—তারা বন্দী থাকবে।

ফ্রান্সিসের মন শান্ত হল। যাক, আমার বন্ধুরা তো বেঁচে থাকবে। বেগমসাহেবা কি যেন ইঙ্গিত করলেন। রহমান এগিয়ে এসে আদাব করল। মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসকে বলল—চল।

* * *

এদিকে ফ্রান্সিসকে নিয়ে রহমান চলে আসার পর ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে লাগল। পরামর্শ মত সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই হঠাৎ একজন উঠে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করল। যেন সেই চীৎকার শুনেই উঠে পড়েছে, এমন ভঙ্গি করে বেশ কয়েকজন ওর দিকে ছুটে এল। লোকটা তখন পেটে হাত দিয়ে গোঙাতে লাগল, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। একজন পাহারাদার ওদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে কাঁটাতারের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো—কি হয়েছে?

—দেখছো না, পেটের ব্যাথায় কাতরাচ্ছে।

—ও কিছু হয়নি।

—বেশ, তুমি নিজেই দেখে যাও।

—হুঁ। পাহারাদারটা ঘুরে দাঁড়ালো।

তখন সবাই মিলে ওকে চটাতে লাগল—ব্যাটা সবজান্তা, তালপাতার সেপাই।

পাহারাদারটা ভীষণ চটে গেল। হেঁকে উঠল—এ্যাই!

কে মুখ ভেংচে ওর হাঁকের নকল মুখ করে বলে উঠল—এ্যাই!

আর যায় কোথায়! পাহাড়াদারটা তালা খুলে ভেতরে ছুটে এল। কিন্তু খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই পাঁচ-ছয়জন একসঙ্গে ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেচারা টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। মাটিতে ফেলে কয়েকজন চেপে ধরল। বাদ-বাকিরা পাহারাদারের কোমর-বন্ধনীর কাপড়টা খুলে ফেলল তারপর মুখ বেঁধে কোণায় ফেলে রাখলো।

এবার খোলা দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে বাইরের অবস্থাটা দেখতে গেল। দেখলো, ওদের যে আর একজন পাহারা দিচ্ছিল সে দেউড়ির কাছে অন্য পাহারাদারের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। প্রাসাদের সম্মুখে দু'জন পাহারাদার শুধু টহল দিচ্ছে। দেউড়ি দিয়ে পালানো যাবে না। ওখানে পাহারাদার সৈন্যদের সংখ্যা বেশি। একমাত্র পথ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে যদি অন্য কোন দিক দিয়ে পালানো যায়। শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। পা টিপে-টিপে সবাই বেরিয়ে এল। অসুস্থ হ্যারিকেও ওরা ধরা-ধরি করে সঙ্গে নিয়ে চলল। আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে ওরা প্রাচীর টপকাল। প্রাচীরের ও'পাশেই দেখা গেল, একটা ছোট্ট বাগান মত। ফোয়ারাও আছে, তাতে। তারপরেই একটা দরজা। দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কয়েকটা ঘর পেরোতেই দেখা গেল লম্বামত একটা ঘর। টানা টেবিলের মত দেয়ালে কাঠের তক্তা লাগানো। কতরকম খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। কোর্মা, কোপ্তা, শিক-কাবারের গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, ওরা রসুই ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। তারপরেই পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। দু' হাত ভরে যে যতটা পারল নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কামড়ে-কামড়ে মাংস খেতে লাগল। এক সঙ্গে এত লোক, তার ওপর খাওয়ার আনন্দ!

অল্প-সল্প শব্দ হতে-হতে একেবারে হই-চই শুরু হয়ে গেল। ওরা বোধহয় ভুলেই গেল, যে ওদের পালাতে হবে। খাবারের ঘরে দরজা দিয়ে তরোয়াল হাতে সৈন্যদল ঢুকতে লাগল। সৈন্যরা ঘিরে ফেলে ওদের পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে হুকুম করল—চলো।

এতক্ষণে ওরা সম্বিত ফিরে পেল। কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই। আবার সেই ফিরে আসতে হল কাঁটার তার ঘেরা বন্দীশালায়।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে দেখলো, প্রাসাদের সামনে চত্বরে সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটোছুটি করছে। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। একজন সৈন্য রহমানকে এসে কি যেন বললো। রহমান ফ্রান্সিসকে বলল—কান্ড শুনেছ ?

—কি ?

—তোমার বন্ধুরা পালিয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসলো। যাক, সমস্যার সমাধান ওরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছে তাহলে। রহমান আড়চোখে ফ্রান্সিসকে হাসতে দেখে বলল—কিন্তু ফিরে আসতে হবে। এখান থেকে পালানো অত সহজ নয়।

ফ্রান্সিসকে কাঁটাতারের বন্দীশালায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস দেখল, পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পালাবার সব পথই বন্ধ। যাক্ সান্ত্বনা, বন্ধুরা তো পালাতে পেরেছে। হঠাৎ পাথরে বাঁধানো চত্বরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—তবে কি ওরা ধরা পড়ল ?

দরজার তালা খোলার শব্দ হল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ঢুকছে। তখনও কারও হাতে পাঁঠার ঠ্যাং, কোর্মার মাংসের টুকরো, শিক-বেঁধা শিক-কাবাব। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে অসুস্থ হ্যারিকে ধরল। তারপর ধরে এনে ওকে শুইয়ে দিল। কেউ কোন কথা বলল না। পরদিন যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, একথা ফ্রান্সিস কাউকে বলল না। শুধু বাইরের সৈন্যদের টহল দেওয়ার শব্দ শোনা গেল—টক্—টক্।

* * *

তখন সকাল হয়েছে। দেউড়ির কাছে যেখানে ফাঁসিকাঠ তৈরী হয়েছে, সারা আমদাদ শহরের মানুষ সেখানে এসে ভেঙে পড়ল। দুর্গে তুরী বেজে উঠল। একটু পরেই ফাঁসিকাঠের পাশে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের এনে দাঁড় করানো হল। ভীড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই বন্দীদের দেখতে চায়। ফ্রান্সিসকে দাঁড় করানো হল ফাঁসিকাঠের মঞ্চের ওপর। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে সুলতান এলেন। পেছনে রহমান। রহমানের পেছনে ও কে ? এ কি ! এ যে সেনাপতিমশাই।

এদিকে হয়েছে কি, ফ্রান্সিসরা যখন ভোরের দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন সেনাপতি একজন পাহারাদারকে ডেকে বলেছিল—আমি রহমানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। পাহারাদারটি প্রথমে রাজী হয়নি। সেনাপতি তখন বলেছিল—রহমানকে শুধু বলবে ভাইকিং দেশের নৌবাহিনীর-সেনাপতি দেখা করতে চায়। পাহারাদারটি কি ভেবে রাজি হল। একটু পরেই ফিরে এসে সেনাপতিকে নিয়ে গেল।

সবাই তখন অঘোর ঘুমে। শুধু অসুস্থ হ্যারি জেগেছিল। সে সবই দেখলো।

বুঝল—সেনাপতি নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। এতে যদি অন্যদের প্রাণও যায়, ও ফিরে তাকাবে না। হ্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে শুয়ে রইল! কাউকে ডাকলও না। ভোর থেকেই সেনাপতিকেও ওরা দেখতে পায়নি। এবার মানে বোঝা গেল। সেনাপতি সুলতানের দলে ভিড়ে গিয়েছে।

সুলতান আসতেই দর্শকদের মধ্যে উল্লাসের বন্যা বইল। চীৎকার করে সবাই সুলতানের জয়ধ্বনি করল। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বললেন, ফ্রান্সিস, গলায় দড়ির ফাঁস পরাবার আগে এখনও সময় আছে; বলো—সেই মোহর দুটো কোথায়?

—আমি জানিনা।

জাহাজ নিয়ে এসেছ, সোনার ঘন্টা নিয়ে যাবে বলে। এবার জাঁহান্নামে যাও, সেখানে সোনার ঘন্টার বাজনা শুনতে পাবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

সুলতান চীৎকার করে বলতে লাগলেন—আমাদের দরিয়ায় এসে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সোনার ঘন্টা নিয়ে যাবে, তোমাদের দুঃসাহস তো কম নয়? সুলতান এবার ফ্রান্সিসের বন্ধুদের দিকে তাকালো। বললো, আমি জাহাজ নিয়ে যাব, তোমাদের জাহাজও মেরামত করিয়ে দেব। তোমরা যদি জাহাজ চালানের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো, তবে তোমাদের আমি মুক্তি দেব।

সবাই চুপ করে রইল। হঠাৎ হ্যারি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আমরা যেতে রাজি, কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন হবে কে?

সুলতান হাসলেন এবং বললেন—তোমাদেরই দেশের নৌবাহিনীর সেনাপতি।

—ওকে আমরা নেতা বলে মানি না, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই—সবাই চীৎকার করে উঠল।

সুলতান মুশকিলে পড়লেন। এই ভাইকিংদের মত দক্ষ জাহাজ-চালকদের ছাড়া তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু নিজের এই সমস্যার আভাসও তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। চীৎকার করে বলে উঠলেন—তোমরা যদি না যাও, তা'হলে তোমাদের সকলের ফ্রান্সিসের দশা হবে। তাকিয়ে দেখ, ওকে কি ভাবে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে।

সুলতান রহমানকে কি যেন বললেন। রহমানের ইঙ্গিতে কালো কাপড়ের আলখাল্লা পরা, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন লোক ফাঁসির মঞ্চে উঠে এল। সে এসে ঘাড়ধাক্কা দিতে-দিতে ফ্রান্সিসকে দড়ির ফাঁসের কাছে নিয়ে এল। কালো কাপড়ের ফুটো দিয়ে লোকটার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

ফ্রান্সিস সম্মুখের সেই দর্শকদের ভিড়ের দিকে তাকাল। বন্ধুদের দিকে তাকাল। দেখলো, হ্যারি চোখের জল মুছছে। আরও কেউ-কেউ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, পাছে চোখের জল দেখে ফ্রান্সিস দুর্বল হয়ে পড়ে। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। সাদা-সাদা হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। পাখি উড়ছে। কি সুন্দর পৃথিবী! ফ্রান্সিসের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। মা'র কথা, বাবার কথা মনে পড়ল। ছোট ভাইটাও কি ওর মতই আধপাগলা হবে? বাড়ির গেটের সেই লতা

গাছটা একদিন সমস্ত দেওয়ালটায় ছড়িয়ে পড়বে। অজস্র নীল ফুল ফুটিয়ে জায়গাটাকে সুন্দর করে তুলবে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, তারা-ভরা আকাশ, ঢেউয়ের মাথায় সূর্য ওঠা—এসব আর কোনদিন দেখবে না সে।

কিন্তু ফ্রান্সিসের চিন্তায় বাঁধা পড়ল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকটা ফাঁসের দড়ি টেনে-টেনে পরীক্ষা করতে-করতে বিড়বিড় করে বলছে—'ফাঁসটা আলগা, হাতের বাঁধনটা সময়মত কেটে নিও। পাটাতনের নীচে গর্তটা বুজিয়ে রেখেছি, নেমেই মাটি পাবে।

ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীর আনন্দে কেঁপে উঠল—ফজল!

ফজল ধমকের সুরে বলল—তোমার মুখে যেমন খুশীর ভাব ফুটে উঠেছে, যেন ফাঁসি হবে না, বিয়ে হবে তোমার। হুঃ!

ফ্রান্সিস সাবধান হলো। ফজল বলতে লাগল—'নীচে পড়েই দড়িটা ধরে দু'চারবার জোরে হ্যাঁচকা টান দেবে। তারপর চুপচাপ বসে থাকবে। রাত হলে পেছনের পাটাতনটা খুলে বেরোবে। সামনেই একটা ঘোড়া পাবে।'

ফজল থামলো। তারপর দু'হাত তুলে সুলতানের দিকে ইঙ্গিত করল—সব ঠিক আছে। এবার সুলতানের হুকুম। সব গোলমাল থেমে গেল।

ফ্রান্সিস হঠাৎ হাত তুলে এগিয়ে এল। সুলতান জিজ্ঞেস করল —কি ব্যাপার।

—মরবার আগে আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—কে সে?

—হ্যারি।

সুলতানের হুকুমে হ্যারিকে ধরে ধরে মঞ্চে নিয়ে আসা হ'ল। হ্যারি আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর ছেলেবেলার বন্ধু ফ্রান্সিস। কত হাসি-কান্না মান-অভিমানের জীবন কাটিয়েছে ওরা। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস নীচুস্বরে বলতে লাগল—হ্যারি, ভয় নেই, আমি মরবো না। যা বলছি, শোন। তোমরা কেউ সুলতানের বিরোধিতা বা সেনাপতির হুকুমের অবাধ্য হয়ো না। আমি আমাদের ভাঙা জাহাজটায় থাকবো। পরে দেখা হবে।

হ্যারি কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ মুছে অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাতে-তাকাতে মঞ্চ থেকে নেমে এল।

ফজল ফ্রান্সিসের মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে দিল। কাপড়টা পরাবার সময় সকলের অলক্ষ্যে ফ্রান্সিসের হাতের বাঁধনটা আল্‌গা করে দিল। তারপর গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে সুলতানের দিকে তাকাল। আবার চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কি হয় দেখবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে। সুলতান হাত তুলে ইঙ্গিত করল। ফজল ফ্রান্সিসের পায়ের নীচের পাটাতনটা এক টানে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস ঝুপ করে নিচে পড়ে গেল। সকলেই দেখলো দড়িটায় কয়েকটা হ্যাঁচকা টান পড়ল। দুলতে-দুলতে দড়িটা থেমে গেল।

ফ্রান্সিসের ফাঁসি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত আমদাদবাসীরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ওদের ফাঁসি দেখা হয়ে গেল। সুলতান, রহমান আর ভাইকিং সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। দর্শকরাও সব আস্তে-আস্তে চলে গেল। ভাইকিং

বন্দীদের নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বধ্যভূমি নির্জন হয়ে গেল।

* * *

দুপুর গেল। সন্ধ্যে পার হল। রাত্রি বাড়তে লাগল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে পেছনের পাটাতনটা ধরে নাড়া দিল। সত্যিই আলগা। সামনেই প্রাচীরের ধার ঘেঁষে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, লেজ ঝাপটাচ্ছে। ঘোড়াটার পিঠে জিন বাঁধা। ফ্রান্সিস এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুত বেগে একটা গলিপথে ঢুকে পড়ল। আন্দাজে দিক ঠিক করে দুর্গের দিকে চলল। সমুদ্র ঐ দিকেই। একসময় হু-হু হাওয়া এসে গায়ে লাগল। সেই সঙ্গে সমুদ্রের মৃদু গর্জন। ঐ তো সমুদ্র। ও'পাশে দুর্গের মত প্রাচীর। সমুদ্রের ধার দিয়ে ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছোটাল, অল্প অল্প চাঁদের আলোয় জল ঝিকমিক করছে। হু-হু হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিনের বন্দী-দশা, উপবাস, এককোঁটা জলও খেতে পায়নি। তবু মুক্তির আনন্দ, বেঁচে থাকার আনন্দ। ফ্রান্সিস প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল। একটু পরেই দূর থেকে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তুর মত ভাঙা জাহাজটা কাত হ'য়ে পড়ে আছে জলের ধারে।

কেবিন ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ফ্রান্সিস। সারাদিন যে উত্তেজনা গেছে, শরীর আর চলছে না। কিন্তু খিদেও পেয়েছে ভীষণ। এতক্ষণেও সেটা বুঝতে পারল। রসুই ঘরটা একবার দেখলে হয়। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। রসুইঘর খুঁজে পেতে দেখলো একজনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে। যাক্ কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। উনুন ধরিয়ে ময়দা-আটা-চিনিগুলো এক অদ্ভুত খাবার তৈরী করলো ফ্রান্সিস। খিদের জ্বালায় তাই খেলো গোগ্রাসে। তারপর একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম।

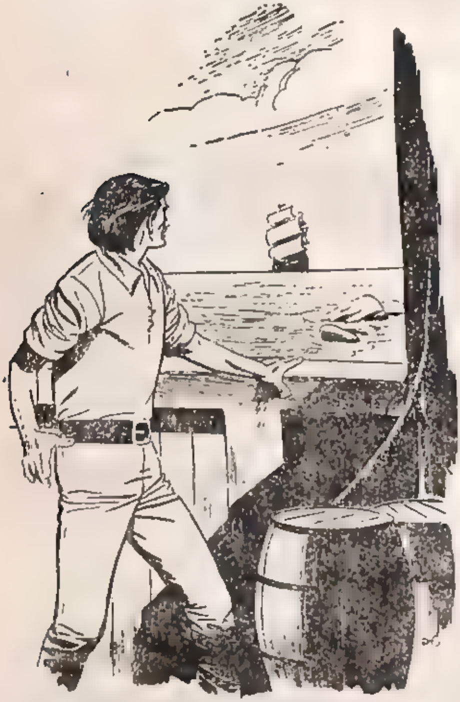

একটা জাহাজ আসছে এই দিকে।

সকাল হয়েছে। রোদ্দুরের তেজ তখনও বাড়েনি। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে আর ভাবছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজটা মেরামত করতে হবে। আবার সমুদ্রে ভেসে পড়তে হবে। সোনার ঘণ্টা আনতেই হবে। কিন্তু কি ক'রে হবে?

ফ্রান্সিস ভেবে-ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না।

পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। একটা জাহাজ আসছে এই

দিকে। খুব সুন্দর ঝকঝকে একটা জাহাজ। বাতাসের তোড়ে ফুলে ওঠা সাদা পালগুলো দেখে মনে হচ্ছে; যেন উড়ন্ত রাজহাঁস। মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে পত্ পত্ করে। ফ্রান্সিস ভাল করে লক্ষ্য করল—হ্যাঁ, সুলতানের জাহাজ। পতাকায় বাদশাহী চিহ্ন ছুটন্ত ঘোড়া আর সূর্য আঁকা।

ফ্রান্সিস আর ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। কেবিন ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল। সুলতানের জাহাজ এদিকে আসছে কেন? তবে কি হ্যারি বিশ্বাসঘাতকতা করলো? অত্যাচারের মুখে সব বলে দিল? ফ্রান্সিসের হদিশ জানিয়ে দিলো? কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিয়ে হ্যারির কি লাভ? লাভ আছে বৈকি? তা'হলে সুলতান ওদের মুক্তি দেবে। সবাই দেশে ফিরে যেতে পারবে।

সুলতানের জাহাজটা বালিয়াড়িতে এসে ভিড়লো। ফ্রান্সিসের সব বন্ধুরা হই-হই করতে-করতে জাহাজ থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিস অনেকটা আশ্বস্ত হল। ওরা যখন এত আনন্দ হই-হল্লা করছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য কারণে জাহাজটা এখানে আনা হয়েছে। গা ঢাকা দিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলের আড়ালে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নেমে আসতেই সৈন্যের দল নেমে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল তারপর সবাই দল বেঁধে এই জাহাজটার দিকে আসতে লাগল। আরো কিছু লোক তখন সুলতানের জাহাজ থেকে করাত হাতুড়ী, পেরেক বড়-বড় কাঠের পাটাতন নামাতে লাগল। তাহ'লে ওদের ভাঙা জাহাজটা মেরামত হবে। ঐ লোকগুলো কাঠের মিস্ত্রী। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মালপত্র নামানো হল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটায় মেরামতির কাজ শুরু হল। ভাইকিংরাও হাত লাগাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্জন সমুদ্রতীর বহুলোকের হাঁকডাকে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে লক্ষ্য করল, হ্যারি কাজ করার ফাঁকে আড়চোখে এই জাহাজটার দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজছে।

* ■ *

দুপুর নাগাদ সুলতানের জাহাজ থেকে কার হাঁক শোনা গেল—'খানা তৈরি। সবাই চলে এসো'। সবাই কাজ রেখে দল বেঁধে জাহাজে খেতে চললো। শুধু হ্যারি থেকে গেল। কেউ-কেউ হ্যারিকে ডাকলো। হ্যারি বলল—হাতের কাজটা শেষ করেই যাচ্ছি। তোমরা এগোও।

জাহাজে ভাঙা হালের জায়গাটায় হ্যারি কাজ করছিল। সে জাহাজের আড়ালে পড়ে গেল। সুলতানের সৈন্যরাও খেয়াল করল না। সবাই জাহাজে উঠে গেল। হ্যারি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। যখন দেখলো; কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না; তখন দড়ি বেয়ে ভাঙা জাহাজটায় উঠে এল। সুলতানের জাহাজ থেকে যাতে পাহারাদার সৈন্যরা দেখতে না পায়, তার জন্যে ডেকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সে কেবিনঘরে নামবার সিঁড়ির কাছে পৌঁছলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চাপাস্বরে ডাকলো—ফ্রান্সিস!

ফ্রান্সিস মাস্তুলের আড়াল থেকে সবই দেখছিল। এবার ছুটে এসে হ্যারিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। হ্যারি প্রথমে একটু চমকেই উঠেছিল; পরক্ষণে গভীর আবেগে ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গন করলো। দুজনেরই চোখ জলে ভরে উঠল। আঃ! ফ্রান্সিস তাহ'লে সত্যিই বেঁচে আছে! সময় অল্প। বেশি কথা হ'ল না। ফ্রান্সিস বললো—

তোমরা কেউ সুলতান বা সেনাপতির হুকুমের বিরোধিতা করো না।

—সে সব আমরা ভেবে রেখেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাজ নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবো তো?

—হ্যাঁ, আমি দিনরাত শুধু ঐ ভাবনা নিয়েই আছি।

—তোমার কি মনে হয়? পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো, পারতেই হবে।

হঠাৎ বাইরের বালিয়াড়িতে বহুকণ্ঠের কলরব শোনা গেলো। হ্যারি দ্রুত উঠে দাড়াল। বললো—এখন চলি। নিশ্চয়ই ওরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

—আবার দেখা হবে। ফ্রান্সিস হেসে হাত বাড়াল। হ্যারি আবেগে ওকে চেপে ধরল। এক মুহূর্ত। তারপরেই দ্রুত পায়ে ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে তীরে বন্ধুদের জটলার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সবাই হই-হই করে উঠল। যাক, হ্যারির কোন বিপদ হয়নি। হ্যারি দড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর বন্ধুরা ওর জন্যে যে খাবার নিয়ে এসছিল, বালির ওপর বসে তাই খেতে লাগলো।

দিন পাঁচেক ধরে এইভাবে জাহাজ মেরামতির কাজ চললো, সুলতানের জাহাজে করে ভাইকিংরা আসে। সঙ্গে সৈন্য আর মিস্ত্রীরা। সারাদিন মেরামতির কাজ চলে। সন্ধ্যে নাগাদ আবার ওদের নিয়ে জাহাজটা আমদাদ বন্দরে ফিরে যায়।

জাহাজ মেরামত হয়ে গেল। নতুন পাল খাটানো হলো। জাহাজ রঙ করা হলো। দেখতে হলো যেন, ঝকঝকে নতুন জাহাজ একটা।

সেদিন হ্যারি লুকিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করল। বললো—কালকে জাহাজ ছাড়বে।

—কখন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—সকালবেলা।

—সুলতান যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

—সে আর বলতে। সুলতানের নাকি ভালো করে ঘুমই হচ্ছে না।

—খুবই স্বাভাবিক—নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি ঘণ্টা তো।

—মরুক গে। তুমি কিন্তু ডেকে উঠবে না।

—হুঁ। ফ্রান্সিস অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল —আচ্ছা, সুলতান সঙ্গে কত সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক বলতে পারবো না। তবে রহমান বলেছিল, বাছাই করা সৈন্য নেওয়া হবে।

—হুঁ। ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

—লড়বে নাকি?

—সে সব সময় আর সুযোগ বুঝে।

হ্যারি আর বসলো না। ওকে না দেখতে পেলে সৈন্যদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। হ্যারি চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল ফ্রান্সিস। কত চিন্তা মাথায়। ঘুম আসতে চায় না। এক সময় ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। দড়ি বেয়ে বালির ওপর নেমে এল। আকাশে চাঁদ, চারদিক ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। নতুন রঙ করা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে

ফ্রান্সিস। সকালকেই তো সমুদ্র যাত্রার শুরু। হয়তো এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। হয়তো সবাই ফিরে যাবে দেশে, তার আর কোন দিন ফেরা হবে না। দেশ থেকে দূরে বহুদূরে এক অজানা সমুদ্রবক্ষে তার মৃতদেহ ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে যাবে। হয়তো তার মৃত্যু নিয়ে দেশের লোকেরা কয়েকদিন জল্পনা-কল্পনা করবে। তারপর আস্তে-আস্তে সবাই তাকে একদিন ভুলে যাবে।

ফ্রান্সিস শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জাহাজটার দিকে। চাঁদের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে জাহাজটার গা থেকে। চারদিকে সেই অসীম শূন্যতার মাঝখানে জাহাজটাকে মনে হতে লাগল, যেন কোন স্বপ্নপুরী থেকে ভেসে এসেছে। বালিয়াড়িতে কিছুক্ষণ পায়চারী করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

* * *

তখন সবে সকাল হয়ে সূর্য উঠেছে। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ওপরের ডেক-এ অনেক লোকের চলাফেরার শব্দ। দড়ি-দড়া বাঁধছে। পাল খাটাচ্ছে। ওদের কর্মচাঞ্চল্যে ঘুমন্ত জাহাজটা জেগে উঠল।

ফ্রান্সিস উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে যে ঘরটায় হ্যারিকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরটায় চলে এলো। এখন থেকে এই ঘরটাই হবে তার আস্তানা। সুলতানের সৈন্যদের চোখের আড়ালে থাকতে হবে। ওরা যাতে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে, ফ্রান্সিস বেঁচে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

রহমানের কথাই ঠিক। সুলতান ভাইকিংদের চেয়ে বেশিসংখ্যক বাছাই করা সৈন্য সঙ্গে নিয়েছেন। কিছু রেখেছেন তাঁর নিজের জাহাজে আর বাকি সব ফ্রান্সিসদের জাহাজে। ভাইকিংদের পাহারা দিতে হবে তো! যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

পাল খাটিয়ে দড়ি-দড়া বেঁধে দুটো জাহাজই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। দুটো জাহাজেই সুলতানের বাদশাহী চিহ্ন ছুটন্ত ঘোড়া আর সূর্য আঁকা পতাকা ভোরের হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে।

তখন সূর্য দিগন্তের একটু ওপরে উঠেছে। আলোর তেজ তখনও প্রখর হয়নি। সুলতান নিজের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে রহমান আর ভাইকিংদের সেই সেনাপতি। সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে বেটপ আলখাল্লা পরা লম্বা দাড়িওলা একটা লোক সুর করে কি যেন দ্রুত ভঙ্গিতে বলতে লাগলো। বোধহয় ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করা হচ্ছে। সুলতান মাথা নীচু করে শুনতে লাগলেন। লোকটা বলা শেষ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। এবার সুলতান মাথা তুললেন। খাপ থেকে তরবারি খুলে নিলেন। তারপর তরবারিটা সমুদ্রের দিকে তুলে যাত্রার ইঙ্গিত করলেন। সকালের আলোয় সোনা-বাঁধানো হাতলওলা তরবারিটা ঝকঝক করতে লাগল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলতে শুরু করল। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজটা মাঝসমুদ্রের দিকে চললো। সুলতানের জাহাজটা চললো পেছনে-পেছনে। সমুদ্রের বুকে কিছুটা এগোতেই হাওয়া লাগল পালে। পালগুলো দুলে উঠল। পরিষ্কার আকাশের নীচে শান্ত সমুদ্রের বুকে দুটো জাহাজ, একটা সামনে আর একটা পেছনে।

দিন যায়, রাত যায়। একা বন্ধ ঘরে ফ্রান্সিসের দিন কাটে, রাত কাটে। হ্যারি

সারাদিনে একবার করে আসে। সব খবরাখবর দেয়। ভাইকিংদের মধ্যে বিশ্বস্ত কয়েকজন মাত্র জানে, ফ্রান্সিস এই ঘরে আছে। তারা কিন্তু ফ্রান্সিসের কাছে আসে না। ফ্রান্সিসের ঘরের বাইরে পালা করে দিনরাত পাহারা দেয়। ওর খাবার-টাবার দিয়ে যায়। সবাই খুব সাবধান—সুলতানের লোক যাতে ফ্রান্সিসের কোনো কথা না জানতে পারে।

* * *

একদিন এক কাণ্ড হলো। সেদিন গভীর রাত। ফ্রান্সিসের ঘরের সামনে পাহারাদার ভাইকিংটা ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ একটা খুট্ করে শব্দ হতেই সে চম্কে উঠে দেখল, একটা ছায়া পিপের আড়ালে সাঁৎ করে সরে গেল। ও তাড়াতাড়ি পাটাতনের আড়ালে লুকনো তরবারি বের করল। কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ একটা গড়গড় শব্দ হতেই ও চমকে ফিরে তাকাল। দেখলো, অন্ধকার থেকে দু'তিনটে পিপে ওর দিকে গড়াতে-গড়াতে ছুটে আসছে। প্রথম পিপেটার ধাক্কায় সে কাঠের মেঝেটায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তরোয়ালটাও হাত থেকে ছিটকে গেল। অন্ধকার থেকে ছায়ামূর্তিটা ছুটে এসে পাহারাদারটার পিঠের ওপর চড়ে বসল। তারপর নিজের কোমর-বন্ধনীর কাপড় দিয়ে পাহারাদারের মুখটা বেঁধে ফেলল।

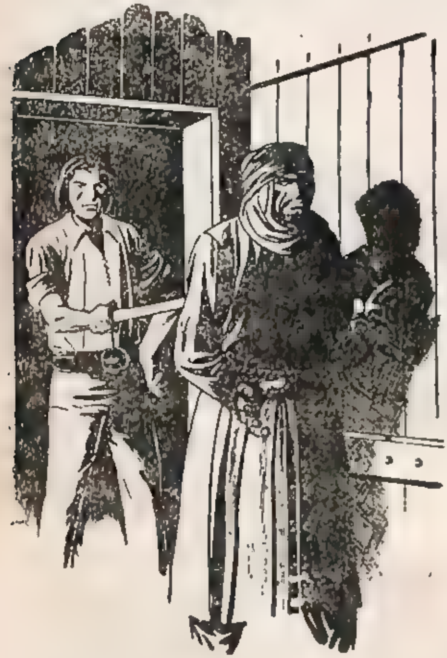

ফ্রান্সিসা চাপাস্বরে বলল—ঘুরে দাঁড়াও।

বাইরের পিপের গড়গড় শব্দে, পাহারাদারের উপুড় হয়ে পড়ার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও নিঃশব্দে বিছানার তলায় লুকানো তরোয়ালটা বের করে পা টিপে-টিপে দরজার দিকে এগোল। কোনরকম শব্দ না করে দরজাটা খুলে বাইরে এসে দেখল, একটা ছায়ামূর্তি পাহারাদারের পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা ছায়ামূর্তির পিঠে ঠেকিয়ে বললো—উঠে পড়ো বাছাধন।

পাহারাদারের মুখ আর বাঁধা হল না। ছায়ামূর্তি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদারটা গোঙাতে লাগলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—ঘুরে দাঁড়াও।

ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিসের চোখে তখন অন্ধকারটা সয়ে এসেছে। সে চোখ কুঁচকে ভালো করে দেখল। আরে? এ কি? এ যে ফজল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে ফজলকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। পাহারাদারটা তখনও গোঙাচ্ছে। ফজল তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দিল। পাহারাদারটা ওদের দু'জনকে দেখেই হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস পাহারাদারকে বলল—যাও ভাই ঘুমিয়ে নাও গে!

ফ্রান্সিস আর ফজল কাঁধ ধরাধরি করে ঘরে এসে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—

ফজল ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।

—কি যে বলো—তোমার কাছেও কি আমার ঋণ কিছু কম।

—অবাক্ কাণ্ড—তুমি এখানে এলে কি করে?

—তোমাকে চাবুক মারা, ফাঁসি দেওয়া, এসব দেখে রহমান আমাকে বেশ বিশ্বাসী লোক বলে ধরে নিয়েছিল। তারপর কিছু ঘুষও দিয়েছি। কাজেই সুলতানের সৈন্যদলে জায়গা পেতে খুব অসুবিধে হলো না।

—আমি এই জাহাজেই যাচ্ছি, তুমি বুঝলে কি করে?

ফজল হাসলো। বললো—সোনার ঘণ্টা আনতে জাহাজ যাচ্ছে, আর তুমি বেঁচে থাকতে সেই জাহাজে যাবে না, এ কি হয়। ভাল কথা তোমাকে যে দু'টো মোহর দিয়েছিলাম, সেগুলো আছে?

—ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহর বিক্রির কথা, মকবুলের মোহর চুরির কথাও বলল।

—মকবুল? ফজল বেশ চমকে উঠল।

—হ্যাঁ, লোকটা নিজের নাম বলেছিল মকবুল।

—কেমন দেখতে বলো তো?

—মোটাসোটা। গোলগাল বেশ হাসিখুশী।

—হুঁ। ফজল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তুমি মকবুলকে চেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করলো।

—ফজল ম্লান হেসে কপালের কাটা দাগটা আঙুল দিয়ে দেখালো—মকবুলের তরোয়ালের কোপের দাগ।

ফজল বলতে লাগল—হ্যাঁ—ভাই, মকবুল আমার খুড়তুতো দাদা। বাবা আর খুড়ো মারা গেল। তারপর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে লাগল গণ্ডগোল। বিষয়সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার সময় পাওয়া গেল একটা পুরানো বাক্স, তাতে সেই মোহর দু'টো। বংশ পরম্পরা ঐ বাক্সটা প্রাপ্য ছিল মকবুলেরই, কিন্তু সে ভীষণ লোভী। একটা ছোট মরুদ্যান আমার ভাগে পড়েছিল। ঐ মরুদ্যানটার ওপর ওর লোভ ছিল বরাবর। সে বলল—'তুই বরং এই মোহরের বাক্স বদলে আমাকে ঐ মরুদ্যানটা দে।' আমি রাজী হলুম, কি হবে ঐ মরুদ্যানটা নিয়ে। আমি তো আর ব্যবসা করবো না। তার চেয়ে বরং আমাদের বংশের একটা স্মৃতি মোহরের বাক্সটাই আমি রাখি, মকবুলের হাতে পড়লে বিক্রি করে দেবে। আমি রাজী হলাম। মোহরের বাক্সটা আমার কাছেই রইল।

—তারপর?

—মকবুল নতুন পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যবসার ধান্ধায় আমদাদ গেল, হায়াৎ গেল, আরো কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। আফ্রিকাও নাকি গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বাড়ি এলো। মোহরের বাক্সটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ চাইলো। আমি দেব কেন? ওকে তো চিনি। নিশ্চয়ই মোহর দু'টো বিক্রি করে দেবে। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম—এই বাক্স আমার, আমি দেব না।

—তারপর?

—সেই রাত্রেই মকবুল আমাকে খুন করতে এল। খুব ভাগ্যিস—আমার ঘুম ভেঙে

গিয়েছিল। তবু তরোয়ালের কোপ এড়াতে পারিনি। কপালে সেই চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি।

—মকবুল মোহর দুটোর জন্যে এত পাগল হয়ে উঠেছিল কেন?

—কারণটা আমি পরে জেনেছি। সোনার ঘণ্টা যে দ্বীপে রয়েছে, সেই দ্বীপে যাবার এবং ফিরে আসার দুটো পথেরই নকশা আঁকা ছিল সেই মোহর দুটোতে।

—তা'হলে কথাটা সত্যি? ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বললো।

—কি সত্যি?

—জানো ফজল, আমিও ঠিক এই কথা শুনেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—যা হোক এই কথাটা জানবার পরই আমি বাড়ি ছাড়লাম। মোহর দুটো রুমালে বেঁধে সব সময় আমার কোমরে রাখতাম। ইচ্ছে ছিল, ঐ নকশাটা কারো কাছে থেকে বুঝে নেব, তারপর কিছু টাকা জমিয়ে জাহাজ কিনে একদিন সোনার ঘণ্টা আনতে যাবো। কিন্তু—

—কেন যেতে পারলে না?

—মরুদস্যুদের দলে ঢুকে পড়লাম, আর ছাড়া পেলাম না।

—আচ্ছা ফজল, তুমি আমাকে মোহর দুটো দিয়েছিলে কেন?

—মকবুলের হাত থেকে মোহর দুটো বাঁচাবার জন্যে।

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো—আশ্চর্য! নিজের জীবন বিপন্ন করেও তুমি যে মোহর দুটো হাতছাড়া করো নি—আমি খিদের জ্বালায় সেটা বিক্রি করে দিলাম।

—তোমার দোষ নেই ভাই। আমারই বোঝা উচিত ছিল। তুমি বিদেশী কে তোমাকে চেনে? কে খেতে দেবে তোমাকে? আশ্রয়ই বা দেবে কে? যাকগে—যা হবার হয়ে গেছে।

—তোমার কি মনে হয়? মকবুল সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যেতে পেরেছে?

—মনে হয় না। কারণ ও একটা মোহরই পেয়েছে। দুটো মোহর আছে জেনে নিশ্চয়ই অন্যটার খোঁজে আছে। জহুরী ব্যাটা সোনার লোভে অন্যটা বোধহয় এতদিনে গালিয়েই ফেলেছে।

গল্প করতে-করতে দু'জনের কারোরই খেয়াল নেই যে, রাত শেষ হয়ে এসেছে। ভোর হয়-হয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের খোঁজখবর নিতে এল। তখন দু'জনের খেয়াল হল যে ভোর হয়েছে। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যে ঝোলানো দড়িটা বেয়ে সে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এসেছিল, সেটা বেয়েই নেমে গেল সমুদ্রের জলে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে সুলতানের জাহাজের কাছে গেল। ওখানেও সে একটা দড়ি ঝুলিয়ে নেমে এসেছিল। সেই দড়িটা বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। তারপর দড়িটা তুলে রেখে পা টিপে-টিপে কেবিন ঘরের দিকে চলে গেল।

* * *

জাহাজ দুটো চলল। দিন যায়, রাত যায়। এদিকে ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। এক চিন্তা—কি করে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়িয়ে সেই সাদা

মন্দিরের দ্বীপটায় জাহাজ নিয়ে যাবে।

হ্যারি আসে। দুজনে পরামর্শ হয়।

একদিন গভীর রাত্রে ফজল এলো। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। ফ্রান্সিস বেশ অবাকই হল। কি ঘটলো এমন? ফজল কোন কথা না বলে কোমর বন্ধনী থেকে খুব সাবধানে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। আস্তে-আস্তে ভাঁজ খুলে ফ্রান্সিসের সামনে পাতলো। পার্চমেণ্ট কাগজের মত শক্ত পুরোনো কাগজ। হলদেটে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝতে না পেরে ফজলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। ফজল বললো—যে বাক্সটাতে মোহর দুটো ছিল, সেই বাক্সে এই কাগজটা পেলাম।

—কিছু লেখা আছে এটাতে?

—না। তবে আমার বেশ মনে আছে, মোহর দুটো এই কাগজটায় জড়ানো ছিল। একটু লক্ষ্য করে দেখো—অনেকদিন জড়ানো ছিল বলে দুটো মোহরের দুপিঠের আবছা ছাপ পড়েছে কাগজটাতে।

ফ্রান্সিস এবার উৎসুক হল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সত্যিই তাই। কাগজটার দুপাশে দুটো অস্পষ্ট ছাপ। একটাতে মাথার ছাপের মত। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণের আভাস। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি পাহারাদারকে ডাকালো। বললো—রসুইঘর থেকে একটু কাঠকয়লার গুঁড়ো নিয়ে এসো।

খুব সন্তর্পণে ফ্রান্সিস সেই কাগজটায় কাঠকয়লার গুঁড়ো ঘষলো। আস্তে-আস্তে ছাপগুলো স্পষ্ট হলো। একটাতে মাথা আঁকা। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণ নকশা দেখা গেল। ফ্রান্সিস বললো—এটা উলটো ছাপ। আলোয় ধরলে সোজা ছাপ পাবো।

ফ্রান্সিস কাগজটাকে আলোর সামনে ধরল। একটা অস্পষ্ট নকশা ফুটে উঠল।

ফজল একটু উসখুস হয়ে ডাকলো—ফ্রান্সিস?

—কি হলো?

—এটা যাওয়ার পথের নকশা।

—হ্যাঁ। কিন্তু কয়েকটা চিহ্নের মানে বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে।

—কিন্তু আমি তো এখন—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি জাহাজে ফিরে যাও। কাগজটা থাক আমার কাছে।

—বেশ—ফজল চলে গেল।

পরের দিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে নকশাটা দেখালো। হ্যারি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। গম্ভীর মুখে বলল—ভুতুড়ে নকশা।

ফ্রান্সিস হাসলো। বললো—এই দেখ, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—বলে ফ্রান্সিস 'ক' 'খ' করে প্রত্যেকটি চিহ্নের আলাদা নামকরণ করল। প্রত্যেকটি চিহ্নের অর্থ কি, তাও বলল।

হ্যারি হতবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তারপর বলল—তুমি কি বুঝলে ত্রিকোণগুলো পাথুরে দ্বীপ?

—ঝড়ের সময় মাস্তুলে উঠে ঠিক যা-যা দেখেছিলাম—নকশাটাতে তাই আঁকা আছে।

—তাহলে এটাই যাওয়ার পথের নকশা?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে 'ক' থেকে 'ঘ' পর্যন্ত এই অস্পষ্ট রেখাটা। রেখাটা আবার 'ঘ' দ্বীপটার চারদিকেও রয়েছে।

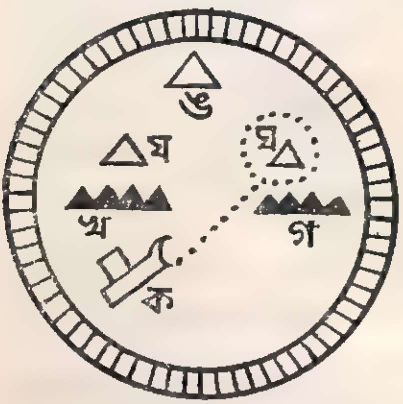

ক=জাহাজ। খ ও গ=ডুবো পাহাড়। ঘ ও ঘ=পাথুরে দ্বীপ। ঙ=সোনার ঘণ্টার দ্বীপ।

—এ তো সোজা।

—সোজা?

—হ্যাঁ, জাহাজটা এই পথে যাবে।

—ধ্যেৎ, এ তো শিশুও বুঝবে—কিন্তু, প্রশ্ন হলো—কি করে?

হ্যারি এবার ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। বললো দাগটা মনে হয় সুতো।

—সুতো?

—হ্যাঁ—সুতো দিয়ে জাহাজটা টেনে নিয়ে যেতে বলছে।

ফ্রান্সিসস এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণেই ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আচমকা এক রন্দা কষালো হ্যারির ঘাড়ে। হ্যারি বিছানা থেকে প্রায় ছিটকে পরে আর কি। ফ্রান্সিসসের সেদিকে নজর নেই। সে তখন বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করেছে। হ্যারি ঘাড়ে হাত বুলোতে অবাক চোখে ফ্রান্সিসসের নাচ দেখতে লাগল। নাচ থামিয়ে ফ্রান্সিসস ডাকল—হ্যারি- ঘাড়ে লেগেছে খুব?

—নাঃ—এমন আর কি! কিন্তু তোমার এই হঠাৎ পুলকের কারণটা কি?

—সুতো।

—সুতো?

—তুমি যে বললে, সুতো দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া।

—তুমি কি তাই করতে চাও নাকি?

—হ্যাঁ—তবে সুতো নয়, মোটা কাছি। দ্বীপটার চারদিকের গোল দাগ মানে কাছিটা দ্বীপের পাথরের সঙ্গে বাঁধতে হবে।

ফ্রান্সিসস হ্যারির পাশে এসে বসলো। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা হ্যারি, আমাদের জাহাজে কাঠের পাটাতন কত আছে?

—আর একটা জাহাজ তৈরি করার মতো নেই।

—কিন্তু একটা বেশ শক্ত নৌকো!

—হ্যাঁ, তা তৈরি করা যাবে।

—আর দাঁড়-কাছি এ সব?

—যথেষ্ট আছে।

—আজ থেকে তাহলে কাজে লাগতে হবে। আমাদের দলের লোকদের ডেকে বলে দাও—সবাইকে হাত লাগাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শক্ত নৌকো তৈরি করতে হবে, আর একটা শক্ত লম্বা কাছি।

—কতটা লম্বা ?

—যতটা লম্বা হতে পারে ?

—বেশ।

* * *

দিন-রাত কাজ চললো। নৌকো, জাহাজ তৈরি করতে ভাইকিংরা খুবই দক্ষ। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সবই জাহাজে মজুত থাকে। দিনকয়েকের মধ্যেই একটা নৌকো তৈরি হয়ে গেল। দাঁড়-দড়া যা ছিল, পাক দিয়ে-দিয়ে বেশ শক্ত কাছিও তৈরি হলো একটা। এবার কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতীক্ষা। পরদিন সকাল থেকেই সূর্যের আলো কেমন ম্লান হয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে এদিক-ওদিক কুয়াশায় জটলা দেখা গেল। হ্যারি ছুটে এলো ফ্রান্সিসের কাছে। বললো—ফ্রান্সিস, আমরা এসে গেছি।

—কুয়াশা ? ফ্রান্সিস শুধু এই কথাটাই বললো।

—হ্যাঁ।

—দাঁড়াও, সেনাপতি কি করে দেখা যাক।

—কিন্তু ওর ওপর নির্ভর করতে গেলে আমাদের জাহাজ টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

—সেনাপতিরও সেই ভয় আছে। দেখোই না, ও কি করে।

সেনাপতি ছিল ফ্রান্সিসদের জাহাজে। সে শিঙা বাজাবার হুকুম দিলো। এই জাহাজে শিঙা বাজাতে সুলতানের জাহাজেও শিঙা বেজে উঠল। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড় টানতে হবে। পাল নামাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় চলে গেল।

জাহাজ চললো। চারদিকের কুয়াশা ঘন হতে লাগল। একটু পরেই পরেই প্রচণ্ড ঝড়ে ঝাপটায় ঢেউগুলি ফুলে উঠে জাহাজের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেনাপতি হুকুম দিল—দাঁড় বাইতে থাকো।

দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ একটু এগোয়, আবার ঝড়ের ধাক্কায় পিছিয়ে আসে। সেই ঝড়ের শব্দের মধ্যে সোনার ঘণ্টা বেজে উঠল—ঢং-ঢং-ঢং। সবাই সেই শব্দ শুনলো। সুলতান নিজের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েই সেই শব্দ শুনলেন। তাঁর চোখ দুটো ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলে উঠল। সোনার ঘণ্টা—এত কাছে ? সেই জল ঝড়ের মধ্যে সেনাপতি দেখলো—দু'দিকে দুটো ডুবো পাহাড়। ঝড়ের ধাক্কাটা আসছে ডানদিক থেকে। ডানদিকের ডুবো পাহাড়ের জন্যে ভয় নেই। কারণ জাহাজ ওদিকে যাবে না। কিন্তু আর একটু এগোলে ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়বে। তারপরের কথা সেনাপতি আর ভাবতে পারলো না। সে আর এগোতে সাহস পেল না। জাহাজ পিছিয়ে নিয়ে আসতে হুকুম দিল। জাহাজ ধীরে-ধীরে পিছিয়ে আসতে লাগল। দেখাদেখি সুলতানের জাহাজটা এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। এই জাহাজের গায়ে এসে লাগল ওটা। ক্রুদ্ধ সুলতান ভাইকিংদের জাহাজে উঠে চীৎকার করে সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—জাহাজ পিছিয়ে নিয়ে এলেন কেন ?

—সামনেই ডুবো পাহাড়। পিছিয়ে না এলে এতক্ষণে দু'টো জাহাজই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমাকে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে নিয়ে যেতেই হবে। সুলতান গর্জে উঠলেন।

সেনাপতি চুপ করে রইলো। সুলতান কিছুক্ষণ সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—কি? আপনি জাহাজ নিয়ে যেতে পারবেন না?

সেনাপতি মাথা নাড়ল—না।

সুলতান চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালেন ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন—তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে?

কেউ কোন কথা বলল না। সুলতান অসহিষ্ণু স্বরে মন্তব্য করলেন—ভাইকিংরা নাকি খুব সাহসী—জাহাজ চালাতে ওস্তাদ?

হ্যারি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললো—কথাটা মিথ্যে নয়, সুলতান।

সুলতান কটমট করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, তার প্রমাণ দাও।

—ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

—তা'হলে তোমরা কেউই পারবে না?

—একজন হয় তো পারে।

—কে সে?

—ফ্রান্সিস!

সুলতান অবাক চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

—আজ্ঞে না। ফ্রান্সিস বেঁচে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

সুলতান ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রহমানের দিকে তাকালেন।

রহমান তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু ফ্রান্সিস বাঁচলো কি করে?

—আপনারা কি সেই ইতিহাসই শুনবেন এখন, না দ্বীপে যাবার চেষ্টা করবেন।

সুলতান এতক্ষণে যেন একটু শান্ত হলেন। ধীর স্বরে বললেন—যদি ফ্রান্সিস দু'টো জাহাজই নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে, তা'হলে ওকে মুক্তি দেবো।

—বেশ। তাহ'লে ফ্রান্সিসকে ডাকি?

—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। এবার আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংরা ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক। পরক্ষণেই সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সুলতান ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি বোধহয় সবই শুনেছ।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি একা মুক্তি চাই না, আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

সুলতান মাথা নীচু করে একটু ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—বেশ। তাই হবে।

সুলতান আর কোন কথা না বলে নিজের জাহাজে ফিরে গেলেন।

ফ্রান্সিস এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—ভাইসব, আমি জানি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো। আমি জীবন দিয়েও তোমাদের সেই বিশ্বাসের

মর্যাদা আমি রাখব।

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। ফ্রান্সিস বললো—অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। জীবনের কোন দুঃখ-কষ্টই বৃথা যায় না। আমরা সফল হবোই। সোনার ঘণ্টার সেই দ্বীপ আমাদের নাগালের মধ্যে। শুধু একটা বাধা—ডুবো পাহাড়। সেই বাধা অতিক্রমের উপায় আমরা জানতে পেরেছি। এখন সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের শক্তি সাহস আর বুদ্ধির ওপরে। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

সবাই চীৎকার করে ফ্রান্সিসকে উৎসাহিত করলো।

ফ্রান্সিস বলতে লাগল—এবার আমাদের কি কাজ তাই বলছি। কয়েকজন চলে যাও জাহাজের পেছনে। সুলতানের জাহাজটা আমাদের জাহাজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে হবে। আর একদল চলে যাবে দাঁড় টানতে। বাকি সবাই থাকবে ডেকের ওপর।

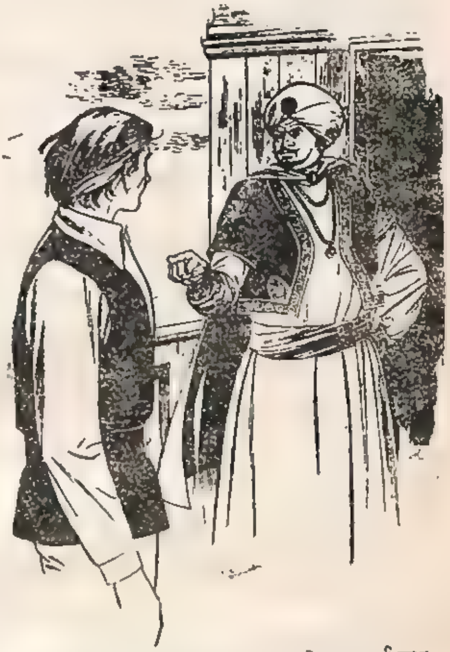

সুলতান ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় সবই শুনেছ।

ফ্রান্সিস একটু থেমে আবার বলতে লাগল—ঝড় শুরু হলেই আমি আর হ্যারি যে নৌকোটা আমরা তৈরি করেছি, সেটাতে চড়ে এগিয়ে যাবো। আমাদের সঙ্গে থাকবে একটা লম্বা কাছি। দুটো ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটু এগোতে পারলেই শান্ত সমুদ্র পাব। তার ডানপাশেই ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপ। সেখানে পাহাড়ের মাথায় আমরা কাছির একটা প্রান্ত বাঁধবো। কাছিটার আর একটা প্রান্ত থাকবে ডেকে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের হাতে। আমি কাছিটার তিনবার ঝাঁকুনি দিলেই তারা টানতে শুরু করবে। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে শুরু করবে। দুটো জাহাজই বিনা বাধায় ডুবো পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারবে। আমরা সফল হবোই।

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। ফ্রান্সিসের নির্দেশমত কাজে লেগে পড়ল সব। জাহাজ আবার এগিয়ে চলল সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে। একটু পরেই কুয়াশার ঘন আস্তরণ ঘিরে ধরলো জাহাজটাকে। তারপরেই শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকোটা জলে ভাসালো। সেই মস্ত লম্বা কাছির একটা প্রান্ত ধরে রইলো জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো ভাইকিংরা। ফ্রান্সিস নৌকোর দাঁড় বাইতে লাগল। হালে বসল হ্যারি। ওরা কাছি ছাড়তে-ছাড়তে এগিয়ে চলল। কিন্তু সেই উঁচু-উঁচু ঢেউ পেরিয়ে এগোনো সোজা কথা নয়। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, ঢেউয়ের ঝাপটা। ফ্রান্সিস প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। সেই প্রচণ্ড দুলুনি উপেক্ষা করে হ্যারি হাল ধরে চুপ করে বসে রইলো।

এমন সময় সোনার ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ শোনা গেল—ঢং—ঢং—ঢং।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরা মহা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে ওদের সেই চীৎকারের শব্দ ফ্রান্সিস আর হ্যারি শুনতে পেল। আজকে চূড়ান্ত লড়াই। দু'জনে নতুন উদ্যমে নৌকো চালাতে লাগল। প্রচণ্ড ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস পাকা নাবিকের মত নৌকো চালাতে লাগল। এক-একবার মনে হচ্ছে নৌকোটা বোধহয় ঢেউয়ের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢেউয়ের মাথায় উঠে আসছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আবছা দেখলো বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের ভেসে ওঠা মাথাটা। সমুদ্রের জলের ঢেউ সরে যেতেই মাথাটা ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের ধাক্কাটা আসছে ডানদিক থেকে। কাজেই যে করেই হোক ডানদিক ঘেঁষেই ওদের বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে ঝড়ের ধাক্কায় নৌকো বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে। নকশাটাতে ডানদিক ঘেঁষে যাওয়ার নির্দেশ আছে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে হ্যারিকে বললো—ডানদিক ঘেঁষে।

হ্যারি শক্ত করে হাল ধরে রইলো। আস্তে-আস্তে নৌকো এগোতে লাগলো। সমস্ত শরীর জলে ভিজে গেছে। যেন স্নান করে উঠেছে দু'জনে। সমুদ্রের নোনা জলে চোখ জ্বালা করছে। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। বুকে যেন আর দম নেই। হাত অবশ হয়ে আসছে। শুধু তো দাঁড় টানাই না, কাছিটাও শক্ত করে ধরতে হচ্ছে মাঝে-মাঝে। সমস্ত কাছিটাই যাতে সমুদ্রের জলে পড়ে না যায়, তার জন্যে ফ্রান্সিস কাছির প্রান্তটা নৌকার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল।

হঠাৎ ডানদিকের ডুবো পাহাড়ে মাথাটা একবার ভেসে উঠেই ডুবে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর কয়েকটা ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোটা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আশ্চর্য আর বৃষ্টি নেই। হাওয়ার তেজও কমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে তাকালো। নৌকো ডুবো পাহাড় ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তারও পেছনে জাহাজ দু'টো। ঝাপসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছে ফ্রান্সিস, ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ দু'টো একবার উঠছে, একবার পড়ছে। আর ঝড় নেই। আকাশে জ্বলন্ত সূর্য। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ। সমুদ্রের ঢেউ শান্ত। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে দু'দিকের পাথুরে দ্বীপ। আরো দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা পাহাড়ের দ্বীপ। পাহাড়ের মাথায় একটা সাদা রঙের মন্দির। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল। হ্যারিও হাসল। কিন্তু আনন্দের সময় এখন নয়। আসল কাজই এখন বাকি।

ডানদিকের ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপটায় ওরা নৌকো লাগাল। নৌকায় বাঁধা কাছির মুখটা খুলে কাঁধে নিলো ফ্রান্সিস। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ছোট্ট পাহাড়। শ্যাওলা ধরা পেছল পাথরে সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে ওরা এক সময় পাহাড়টায় মাথায় উঠে এল। তারপর কাছিটাকে শক্ত প্যাঁচ দিয়ে পাহাড়ের মাথায় বাঁধলো। টেনে দেখলো, যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। দু'জনে মিলে কাছিটাকে যাথাসাধ্য টান-টান করে ধরল। তারপর তিনবার জোরে ঝাঁকুনি দিলো। জাহাজের ডেকে যারা কাছিটার আর একটা প্রান্ত ধরে ছিল, তারা সংকেতটা বুঝতে পারল। তারা এবার সবাই মিলে কাছিটা টানতে লাগল। দাঁড়িদেরও খবর দেওয়া হলো। তারাও প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। জাহাজ

দু'টো সেই জল-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দোল খেতে-খেতে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। একসময় ডুবো পাহাড় দুটোও পেরিয়ে গেল। হঠাৎ আর বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। শান্ত সমুদ্র। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু ঝলমলে রোদ। সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। একদল ডেকের ওপর নাচতে শুরু করলো। কেউ-কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরলো। সুলতানের জাহাজেও আনন্দের বান ডাকলো। সৈন্যরা কেউ-কেউ চীৎকার করতে-করতে শূন্যে তরোয়াল ঘোরাতে লাগল। সুলতান ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে সবাইকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কাছি বেয়ে-বেয়ে জাহাজে উঠে এল। সবাই উঠে এলো ওদের জড়িয়ে ধরবার জন্যে। ওদের দু'জনকে কাঁধে নিয়ে নাচা-নাচি শুরু হয়ে গেল। সেই শান্ত সমুদ্রের বুক ভরে উঠল বহু কণ্ঠের চীৎকার, হই-চই আর আনন্দধ্বনিতে। জাহাজ দু'টো এবার চললো সামনের সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দ্বীপটার দিকে। চূড়োয় সাদা গোল মন্দিরটায় সূর্যের আলো পড়ছে। ওখানেই আছে সোনার ঘণ্টা।

দূরত্ব বেশি নয়। একটু পরেই জাহাজ দু'টো সবুজ ঘাসে ঢাকা দ্বীপটায় এসে ভিড়ল। দ্বীপে প্রথমে নামলেন সুলতান। তাঁর সঙ্গে রহমান, তারপর আরো কয়েকজন সৈন্য। সুলতান ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো। তারপর সবাই সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগল। খাড়া পাহাড় নয়, কাজেই পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে ঝোপ-ঝাড় ধরে উঠতে খুব একটা কষ্ট হলো না। মন্দিরের কাছে পৌঁছে সবাই থামলো। তাকিয়ে-তাকিয়ে গোল মন্দিরটা দেখলো। সাদাটে রঙের আস্তরণ মন্দিরটায়। এখানে-ওখানে সবুজে শ্যাওলার ছোপ। জাহাজ থেকে যতটা ছোট মনে হচ্ছিল, ততো ছোট নয়। মন্দিটার একটা মাত্র ছোট দরজা। দরজাটা খোলা। কোন পাল্লা নেই। সুলতান একাই মন্দিরটার দিকে এগোলেন। আর সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। জাহাজের সবাই ডেকে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখছে এখানে কি ঘটছে। সবার মনেই বোধহয় এক প্রশ্ন — সোনার ঘণ্টা কি এখানেই আছে?

সুলতান মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। সবাই উৎকণ্ঠিত। সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ হয়ে আছে। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার শব্দ। শুধু বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। আর কোন শব্দ নেই। এতগুলো মানুষ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

একটু পরে সুলতান ধীরে পায়ে মন্দিরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে একবার ফ্রান্সিসের দিকে আর একবার রহমানের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফ্রান্সিসের বুক দমে গেল। তবে কি সোনার ঘণ্টা এখানে নেই। এত দুঃখ-কষ্ট, এত পরিশ্রম সব অর্থহীন — সব ব্যর্থ।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পরল না। ছুটে মন্দিরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। কোথায় সোনার ঘণ্টা? মন্দিরটার মাথা থেকে পেতলের শেকলে ঝুলছে একটা পেতলের ছোট্ট ঘণ্টা। চারিদিকেই দেয়াল। আর কিছু নেই মন্দিরটাতে। রাগে-দুঃখে ফ্রান্সিসের চোখ ফেটে জল এলো। এই তুচ্ছ একটা পেতলের ঘন্টার জন্যে এত দুঃখ-কষ্ট? সেই ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই স্বপ্ন এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সোনার

ঘণ্টার গল্প তা'হলে একটা ছেলেভুলোনো কাহিনী মাত্র ? ফ্রান্সিসের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে দু'হাতে পেতলের ঘণ্টাটা জোরে ছুঁড়ে দিলো দেওয়ালের গায়ে।

ঢং—ঢং—ঢং—প্রচণ্ড শব্দে ফ্রান্সিস ভীষণ চমকে উঠল। দু'হাতে কান চেপে বসে পড়ল। একি ? তবে কি—তবে কি—সমস্ত গোলাকার মন্দিরটাই একটা সোনার ঘণ্টা ?

ঢং—ঢং—ঘণ্টার শব্দ বেজে চললো। বাইরে সুলতান, রহমান হ্যারি, সঙ্গের সৈন্যরা, নীচে জাহাজের উৎসুক ভাইকিংরা সবাই প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গোল মন্দিরটার দিকে। এত-বড় সোনার ঘণ্টা ! ঢং—ঢং,-গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাথার ওপর নীল আকাশের শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে দূর-দূরান্তরে।

সুলতানের মুখে হাসি ফুটলো। ফ্রান্সিস মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হ্যারি তাকে জড়িয়ে ধরলো। আনন্দে অতগুলো মানুষের চীৎকার হৈ-হল্লায় নির্জন দ্বীপ মুখর হয়ে উঠল, কিন্তু এই আনন্দ আর উল্লাসের মুহূর্তে কেউই লক্ষ্য করেনি, যে সেই ডুবো পাহাড়ের দিক থেকে একটা জাহাজ তীরবেগে সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে।

সেই জাহাজটাকে প্রথম দেখলো রহমান। সে সুলতানের কছে ছুটে এলো। সুলতান তখন সোনার ঘণ্টার বাইরের পলেস্তারাটা কতটা শক্ত, তাই পরীক্ষা করছিলেন। রহমান সুলতানকে জাহাজটা দেখালো। তখন জাহাজটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এতক্ষণে সবাই দেখতে পেল সেই দ্রুত ছুটে আসা জাহাজটাকে। একটা কালো পতাকা উড়ছে জাহাজটায়। তাতে সাদা রঙের মড়ার মাথার খুলি আর ঢ্যাড়ার মত দু'টো হাড়ের চিহ্ন আঁকা। জলদস্যুদের জাহাজ ! নীচের জাহাজ দু'টোয় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলো। সুলতান, রহমান, ফ্রান্সিস সবাই দ্রুত পায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে লাগল।

জলদস্যুদের জাহাজটা প্রথমে সুলতানের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। খালি গা, মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা জলদস্যুদের জাহাজটা এবার ফ্রান্সিসের জাহাজের গায়ে লাগল। সেখানেও শুরু হল তরোয়ালের যুদ্ধ। চীৎকার, হই-চই, তরোয়ালের ঠোকা-ঠুকির শব্দ, আহত আর মুমূর্ষুদের আর্তনাদে ভরে উঠল সমস্ত এলাকাটা। লড়াই চলতে লাগল। সুলতান রহমান, ফ্রান্সিস তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়লো তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের উপর।

যুদ্ধ করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস মকবুলকে দেখতে পেল। তার পরনে জলদস্যুদের পোশাক নয়, আরবীয়দের পোশাক। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কাছে সব স্পষ্ট হলো। তা'হলে মকবুলই এই জলদস্যুদের সোনার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের ফাঁকে এক সময় ফ্রান্সিস চীৎকার করে মকবুলকে ডাকলো—মকবুল, আমাকে চিনতে পারছো ?

মকবুল ওর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—আমি বেঁচে থাকতে সোনার ঘণ্টা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিপুণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

—ফ্রান্সিস ! ডাক শুনে ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল ফজল।

—মকবুল এদের সঙ্গে তাই না ? ফজল জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক ধরেছ।

—কিন্তু ওরা এল কি করে ?

—আমাদের জাহাজ অনুসরণ করে ওরা এসেছে। আমরা যেভাবে ডুবো পাহাড় পেরিয়েছি, ওরাও ঠিক সেইভাবেই পেরিয়েছে।

—মকবুলকে দেখেছো ?

—ঐ যে মাস্তুলটার ও'পাশে লড়াই করছে।

ফজল আর দাঁড়ালো না। সেইদিকে ছুটলো। মকবুল কিছু বোঝবার আগেই ফজল মকবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'জনের লড়াই শুরু হয়ে গেল। মকবুলের তুলনায় ফজলের হাত অনেক নিপুণ। ফজল বেশ সহজ ভঙ্গিতেই তরোয়াল চালাচ্ছিলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মকবুল বেশ হাঁপিয়ে পড়লো। ফজলও হাঁপাচ্ছিল। একবার দম নিয়ে ফজল বললো—মরুদস্যুদের দলে ঢুকেছিলাম, শুধু এই তরোয়াল চালানো শেখবার জন্যে। তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখিয়ে বলল—এটার বদলা নিতে হবে তো।

মকবুল কোন কথা না বলে তরোয়াল উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার লড়াই শুরু হল। প্রথম আক্রমণের মুখে ভাইকিং আর সুলতানের সৈন্যরা হকচকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে তাদের বেশি সময় লাগল না। সুলতানের বাছাই করা সৈন্য আর দুর্ধর্ষ ভাইকিংদের হাতে জলদস্যুরা কচু-কাটা হতে লাগল। ওরা পিছু হটতে লাগল। দু'জন একজন করে নিজেদের জাহাজে পালাতে লাগল।

এদিকে মকবুল ফজলের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে হঠাৎ দড়িতে পা আটকে ডেকের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফজল ওর বুকে তরোয়ালটা চেপে ধরল। দু'জনেই ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে তখন। দেখতে পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এলো। ফজলের হাত চেপে ধরে বলল—ফজল, ওকে মেরে ফেল না।

ফজল দাঁত চিবিয়ে বললো—আমি যদি না মারি, ও আমায় মারবে।

—তবু আমার অনুরোধ, ওকে ছেড়ে দাও।

ফজল এক মুহূর্ত ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—বেশ। তোমার কথাই রাখলাম।

ফজল তরোয়াল সরিয়ে নিলো। মৃত্যু-ভয়ে মকবুলের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে ও বেঁচে গেল, এটা ওর বুঝতে সময় লাগল। কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ডাকলো—মকবুল!

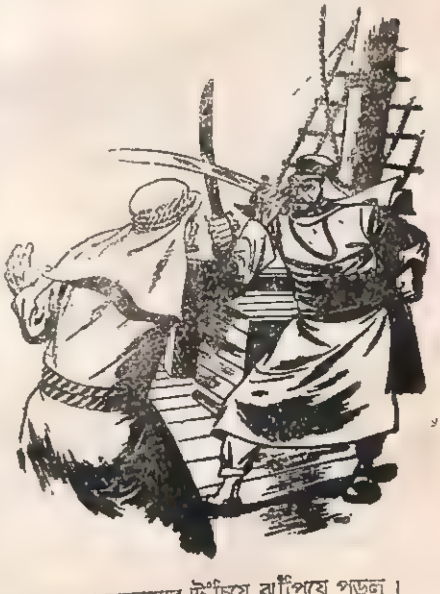

মকবুল তলোয়ার উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মকবুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

—এই জলদস্যুরা কি তোমার বন্ধু? তুমি কি এদের সঙ্গে ফিরে যেতে চাও?

—না।

—এখনও ভেবে দেখো, ওরা কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে।

সত্যিই জলদস্যুরা তখন নিজেদের জাহাজে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। বাকি কয়েকজন গিয়ে উঠলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। মকবুল ভয়ার্ত চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো। বললো—না-না, আমাকে ঐ জাহাজে আর পাঠিয়ো না।

—কেন? ফ্রান্সিস ব্যঙ্গ করে বললো—তোমার বন্ধু ওরা। তোমার জন্যে সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করে দিতে এসেছিলো। এক সঙ্গেই যেমন এসেছো, ফিরেও যাও একসঙ্গে।

—না-না, ওরা আমাকে পেলে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বললো—এবার আমার মোহরটা ফেরত দাও।

মকবুল কোমরবন্ধনী থেকে একটা থলে বের করলো। থলে থেকে ফ্রান্সিসের সেই চুরি যাওয়া মুদ্রাগুলো আর মোহরটা বের করে ফ্রান্সিসের হাতে দিলো। মোহরটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস আর ফজল মোহরটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। মনোযোগ দিয়ে উলটো পিঠের দ্বীপ থেকে ফিরে আসার নকশাটা দেখতে লাগল।

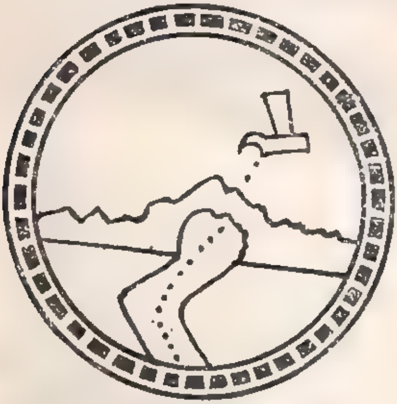

'সোনার ঘণ্টা'র দ্বীপ থেকে ফিরে আসবার সুড়ঙ্গ পথের নক্সা

মকবুল ক্রুর হাসি হেসে বললো—অন্য মোহরটা যদি পেতাম, তাহলে এই সোনার ঘণ্টা তোমরা নিয়ে যেতে পারতে না।

—জানি। ফ্রান্সিস মোহরটা থেকে চোখ না সরিয়েই বললো।

জলদস্যুদের দল দ্রুত জাহাজ চালিয়ে সরে পড়লো। ওদের জাহাজ সমুদ্রের দিগন্তে মিলিয়ে যেতেই সুলতান সোনার ঘণ্টা নামিয়ে আনার হুকুম দিলেন। সৈন্যরা সব দড়ি জোগাড় করে তৈরি হতে লাগলো।

নীচে জাহাজে তখন যুদ্ধ চলছিল, তখন সুলতানের হুকুমে মিস্ত্রীরা সোনার ঘণ্টার গা থেকে পলেস্তারা খসাচ্ছিলো। এতক্ষণে পলেস্তারা খসানো শেষ হলো। সবই কাজ ফেলে ডেকে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। প্রখর সূর্যালোকে সোনার ঘণ্টার গা থেকে এক চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি বেরুচ্ছে। বিস্ময়ে অবাক চোখে সবাই তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অন্ধকার নামলো সোনার ঘণ্টার দ্বীপে, বালিয়াড়িতে, সুদূর প্রসারিত সমুদ্রের বুকে। দ্বীপের বালিয়াড়িতে মশাল পুঁতে মিস্ত্রীরা কাজ করে চলেছে। কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে দিয়ে বিরাট একটা কাঠের পাটাতন তৈরি করা হতে লাগল। ঐ পাটাতনে রাখা হবে সোনার ঘণ্টা। তারপর জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে।

* * *

রাত গভীর তখন। আকাশে আধভাঙা চাঁদ। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ডেকের ওপরে পায়চারী করছে। কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছে মশালের আলোগুলো কাঁপছে। ঠক্‌-ঠক্‌ পেরেক পোঁতা শব্দ উঠছে। মিস্ত্রীদের কথাবার্তাও কানে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেদিকে কান নেই। নিজের চিন্তায় সে ডুবে আছে। এত দুঃখ-কষ্টের পর সোনার ঘণ্টা যদিও বা পাওয়া গেল, কিন্তু সেটাকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া হলো না! ফ্রান্সিস পাহাড়ী দ্বীপের চূড়োর দিকে তাকালো! জ্যোৎস্না পড়েছে সোনার ঘণ্টার মসৃণ গায়ে। একটা মৃদু আলো চারিদিক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওটা যেন মাটিতে নেই। শূন্যে ভাসছে। স্বপ্নময় রহস্যেভরা এক অপার্থিব সৌন্দর্যের আভাস। ফ্রান্সিসের মন বিদ্রোহ করলো। অসম্ভব! এমন সুন্দর একটা জিনিস, যেটাকে ঘিরে তার আবাল্যের স্বপ্ন গড়ে উঠেছে, সেটা এভাবে শুধু অর্থ আর লোকবলের জোরে সুলতান নিয়ে যাবে? আর ওরা তাকিয়ে দেখবে? না, এ কখনই হতে পারে না। আপন মনেই ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল—না-না। যে করেই হোক, সোনার ঘণ্টা তারা নিজের দেশে নিয়ে যাবে। এতে যদি তাদের জীবন বিপন্ন হয় হোক।

পরদিন সকালেই ঘণ্টার মাপ অনুযায়ী একটা মস্ত বড় কাঠের পাটাতন তৈরি হলো। এবার সোনার ঘণ্টা নামিয়ে আনবার পালা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে যে ক'টা খাটো গাছ ছিল, তাতেই দড়ি-দড়া বেঁধে কপিকলের মত করা হলো। তারপর সোনার ঘণ্টা বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে নামানো হতে লাগল। কিন্তু দড়ি-দড়ার কপিকল সোনার ঘণ্টার অত ভার সহ্য করতে পারল না। দু'তিন জায়গায় দড়ি ছিঁড়ে গেল। একটা গাছ তো গোড়াসুদ্ধ উপড়ে গেল। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে সোনার ঘণ্টা ঢং—ঢং—শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়লো বালিয়াড়ির ধারে। কয়েকজন ছেঁড়া দড়ি-দড়াসুদ্ধ ছিটকে মারা পড়লো। কিন্তু সুলতানের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। হুকুম দিলেন, যে করেই হোক সোনার ঘণ্টা কাঠের পাটাতনের ওপর তুলতে হবে। আবার দড়ি-দড়া বেঁধে সবাই বহুকষ্টে সোনার ঘণ্টাটাকে কাঠের পাটাতনের ওপর তুলল। তারপর সেটাকে সুলতানের জাহাজের পেছনে বেঁধে যাত্রা শুরু হলো আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।

মোহরের গায়ে যে নকশা আঁকা ছিল দেখে হিসাব করে ফ্রান্সিসই ফেরার পথের নিশানা বের করলো। জাহাজ দু'টো চললো সেই পথ ধরে একটা অদ্ভুত পাহাড়ের নির্দেশ দেওয়া ছিল নকশাটায়। সেই উঁচু পাহাড়টার নীচে একটা টানা সুড়ঙ্গ পথ। ফ্রান্সিস হ্যারিকে যখন নকশাটা বোঝাল, হ্যারি বলল—তা'হলে এই সুড়ঙ্গ পথটা দিয়েই তো আসা যেতো?

ফ্রান্সিস হাসলো। বললে—প্রথমতঃ এই সুড়ঙ্গ পথের খবর আমরা জানতাম না।

—আর দ্বিতীয় কারণ?

—আমার মনে হয়, ঐ পথ দিয়ে একটা জাহাজ এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারে, কিন্তু ওদিক থেকে এদিকে আসতে পারে না।

—এ আবার হয় নাকি। হ্যারি অবাক হলো।

—প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। ফ্রান্সিস হাসলো।

সন্ধ্যের সময় সেই উঁচু পাহাড়টার দেখা পাওয়া গেল। কাছে যেতে সুড়ঙ্গ পথটাও

দেখা গেল। একটা জাহাজ যেতে পারে, এমনি বড় পথ সেটা ফ্রান্সিসের অনুমানই ঠিক।

সামনে রাত্রির অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথে ঢোকা বিপজ্জনক। স্থির হলো সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পরদিন সকালে প্রথমে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ধীরে-ধীরে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলো। একটু এগোতেই বাইরের আলো ম্লান হয়ে গেল। কেমন ছায়া-ছায়া হয়ে এল ভেতরটা। তবু মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া ছাদ, দু'পাশের পাথুরে দেওয়াল দেখা যাচ্ছিলো। সুড়ঙ্গটা একটা জায়গার বাঁক নিয়েছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে দেওয়ালে ধাক্কা না লাগিয়ে জাহাজটাকে বাঁক ঘুরিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো। বাঁক ঘুরতেই এক অপূর্ব দৃশ্য! এদিকে ওদিকে থামের মত গোল এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে দেয়াল থেকে উঠে ওপরের ছাদের সঙ্গে লেগে আছে যেন। সেগুলোর গায়ে নীলাভ দ্যুতিময় পাথরের টুকরো। ওপরের পাথুরে ছাদেও কত বিচিত্র বর্ণের পাথর। সেই ছাদের গা বেয়ে কোথাও বা শীর্ণ ঝরণার মত জল পড়ছে। যেটুকু আলো সুড়ঙ্গের বাইরে আসছিল, তাই দ্বিগুণিত হয়ে জায়গাটায় এক অপার্থিব আলোর জগৎ রচনা করেছে। বিচিত্র বর্ণের মৃদু আলোর বন্যা যেমন। সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

ভাইকিংদের মধ্যে দু'-একজন হাতুড়ি নিয়ে এলো। হাতের কাছে এত সুন্দর রঙিন পাথর। পাথুরে থামের গায়ে-গায়ে সেই নীলাভ পাথরের ঝিলিক। লোভ সামলানো দায়। ওরা নিশ্চয় থামগুলো ভেঙে পাথর নিয়ে আসতো। কিন্তু পারলো না ফ্রান্সিসের জন্যে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে বললো—কেউ থামগুলোর গায়ে হাত দেবে না।

ফ্রান্সিসের গম্ভীর কণ্ঠস্বর সুড়ঙ্গটায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

—কেন? হাতুড়ি হাতে একজন ভাইকিং বললো।

—এই থামগুলো পাহাড়টার ভারসাম্য রক্ষা করছে। যদি কোন কারণে ভেঙে যায়, সমস্ত পাহাড়টাই জাহাজের ওপর ভেঙে পড়বে।

সবাই বিপদের গুরুত্বটা বুঝলো। অগত্যা চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া উপায় কি? সবাই নিঃশব্দে সেই অপূর্ব স্বপ্নময় জগতের রূপ দেখতে লাগলো। জাহাজ এগিয়ে চললো।

একসময় সুড়ঙ্গের ওপাশে আলো ফুটে উঠল। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে আসছে। সুড়ঙ্গের মুখ ছেড়ে জাহাজটা বাইরের রৌদ্রালোকিত সমুদ্রের বুকে আসতেই সবাই আনন্দে হই-চই করে উঠল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

—কি?

—সুড়ঙ্গটা ভেতরের দিকে একটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে। এ'পাশের কোন জাহাজই সেই বাঁক পেরোতে পারবে না।

—হ্যাঁ, এটা সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার।

পর-পর সুলতানের জাহাজ আর 'সোনার ঘণ্টা' বসানো কাঠের পাটাতনটাও সুড়ঙ্গ পেরিয়ে চলে এলো। আবার চললো জাহাজ শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।

সবাই নিশ্চিন্ত। যাক, অনেকদিন পরে আবার মাটির ওপর পা ফেলা যাবে। ভাইকিংদের কাছে আমদাদ বিদেশ। তবু হোক বিদেশ, মাটি তো! সুলতানের আদেশে

মিস্ত্রীরা এর মধ্যেই বড়-বড় চাকা বানাতে শুরু করেছে। সোনার ঘণ্টা বসানো পাটাতনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। চাকা লাগাতে পারলে কোন অসুবিধে নেই। ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। চাকা বানানোর কাজ চলছে পুরো দমে। জাহাজের সবাই খুসিতে মশগুল।

কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। শুধু হ্যারিই ওর একমাত্র সমব্যথী। গভীর রাত্রে ডেকের ওপর দু'জনে দেখা হয়। সোনার ঘণ্টার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলে—জানো হ্যারি, ওটা আমাদের প্রাপ্য, সুলতানের নয়।

—কিন্তু উপায় কি বলো!

—উপায়—বিদ্রোহ।

—সে কি! হ্যারি চমকে ওঠে।

ফ্রান্সিস ডেকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে-করতে বলে—কালকে রাত্তিরে কয়েকজন ভাইকিংকে নিয়ে এসো। সুলতানের সৈন্যদের একটু কায়দা করে হার স্বীকার করাতে হবে। তারপর সোনার ঘণ্টা নিয়ে আমরা দেশের দিকে পাড়ি জমাবো।

—সুলতানের সৈন্যরা কিন্তু সংখ্যায় আমাদের প্রায় দ্বিগুণ।

—হ্যারি, আমি সব ভেবে রেখেছি।

পরের দিন গভীর রাত্রে ফ্রান্সিসের ঘরে সভা বসলো। কয়েকজন বিশ্বস্ত ভাইকিং এলো। কিভাবে বিদ্রোহ হবে, সুলতানের সৈন্যদের কিভাবে বোকা বানানো হবে, এসব কথা ফ্রান্সিস কিছু ভাঙলো না। শুধু ওদের মতামত চাইলো। দু'জন বাদে সবাই ফ্রান্সিসকে সমর্থন করলো। সেই দুজন বললো—যদি বিদ্রোহ করতে গিয়ে আমরা হেরে যাই, সুলতান আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। কারণ ওর কাছে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস বলল—কথাটা সত্য! কিন্তু এ ছাড়া আমাদের উপায় কি? একবার আমদাদের রাজপ্রাসাদে সোনার ঘণ্টা নিয়ে যেতে পারলে আমরা কোনদিনই ওটা উদ্ধার করতে পারবো না।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের কপাল মন্দ। এ-কান সে-কান হতে হতে কথাটা সুলতানের কানে গিয়েও উঠলো। সুলতান সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ভাইকিংদের কাছ থেকে তরবারি কেড়ে নেবার হুকুম দিলেন। তারপর নিরস্ত্র ভাইকিংদের জাহাজের নীচের কেবিনে বন্দী করে রাখা হল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরাও বাদ গেল না। সুলতান বোধহয় কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ফ্রান্সিসের বিদ্রোহের পরিকল্পনা সমস্ত ভেস্তে গেল।

* * *

তখনও সূর্য ওঠেনি। আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দূরে আমদাদের দুর্গ-চূড়া দেখা গেল। সূর্য উঠল। চারিদিক আলোয় ভেসে গেল। আমদাদ বন্দরের জাহাজ, লোকজন, দুর্গের পাহারাদার সৈন্য সব স্পষ্ট হলো। বন্দর আর বেশি দূরে নেই।

জাহাজ দু'টো বন্দরে ভিড়লো। কিন্তু এ কি হলো? জনসাধারণের মধ্যে সেই আনন্দ উল্লাস কোথায়? কই কেউ তো সুলতানের জয়ধ্বনি দিচ্ছে না। দলে-দলে ছুটে আসছে

না, সেই আশ্চর্য সোনার ঘণ্টা দেখতে ? সবাই যেন পুতুলের মত নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখছে সুলতানের জাহাজ তীরে ভিড়লো, পেছনে সোনার ঘণ্টার পাটাতন, তারপর ভাইকিংদের জাহাজ।

সুলতান আর রহমান রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চললেন রাজ-প্রাসাদের দিকে। পেছনে হাতে দড়ি বাঁধা ভাইকিংদের দল। তাদের দু'পাশে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাদের পেছনে সোনার ঘণ্টা টেনে নিয়ে আসছে আটটি ঘোড়া। চাকা বসানো পাটাতন গড়গড়িয়ে চলছে। এত কাণ্ড সব, তবু রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো আমদাদবাসীদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। সৈন্যরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। এসব সুলতানের রাগ বেড়েই চললো। এর মধ্যে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা সুলতান বা ভাইকিংরা কেউই জানতো না। ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা ভাইকিং রাজার জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসার কয়েকদিন পরে ভাইকিংদের রাজা মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করেন। রাজার সঙ্গে ছিল দু' জাহাজ ভরতি সৈন্য। তারা ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে-করতে এই আমদাদ-নগরে এসে উপস্থিত হল। তখন সুলতান সৈন্য আর ভাইকিংদের নিয়ে সোনার ঘণ্টার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। সুলতানের সঙ্গে বাছাই করা সৈন্যরা চলে গেছে। ভাইকিংদের রাজা খুব সহজে যুদ্ধ করে দখল করে নিলেন। এবার সুলতানের আর ভাইকিংদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করা।

যেদিন সুলতান সোনার ঘণ্টা নিয়ে ফিরলেন, সেদিন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো লোকজন আর সুলতানের সৈন্যদের আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হল — সবাই যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সুলতান যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারেন, আমদাদ শহর বিদেশীরা দখল করে নিয়েছে। তাই সেদিন কোথাও না ছিল উত্তেজনা, না ছিল উল্লাস। সুলতানের প্রত্যেকটি সৈন্যের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ভাইকিং সৈন্যরা আত্মগোপন করে ছিল। কেউ যেন টুঁ শব্দটি না করে। ভাইকিংদের রাজা চাইছিলেন — সুলতান যেন আগে থাকতে কোনো বিপদ আঁচ করে পালাতে না পারেন।

রাজপথ দিয়ে চলেছেন সুলতান। পেছনে বন্দী ভাইকিংরা। তারও পেছনে সোনার ঘণ্টা। প্রাসাদের কাছে এসে সুলতান দেখলেন, প্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মন্ত্রী ও প্রধান-প্রধান অমাত্যরা বসে আছেন। মাঝখানে সুলতানের সিংহাসন, সেটা ফাঁকা। তার পাশে একটা সিংহাসনে বেগম বসে আছেন। সুলতান এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ বেগম সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজপথ দিয়ে সুলতানের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। কারা যেন তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে বেগম অনেকটা চলে এসেছেন। সুলতান স্পষ্ট শুনলেন, বেগম চীৎকার করে বললেন — পালাও, পালাও ভাইকিংরা এদেশ দখল করে নিয়েছে।

কিন্তু বেগম কথাটা আর দু'বার বলতে পারলেন না। তার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বর্শা বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে তাঁর পিঠে ঢুকে গেল ! বেগম রাজপথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গিয়ে বেগমের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বেগম ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন — পালাও —

আর কিছু বলতে পারলেন না। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ততক্ষণে সুলতানের সৈন্যদের সঙ্গে ভাইকিং সৈন্যদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষেরা চীৎকার করতে-করতে যে-যেদিকে পারছে, ছুটে পালাতে শুরু করেছে। ব্যাপার দেখে ফ্রান্সিসরা তো অবাক। তারপর ওরা সব বুঝতে পারলো। ভাইকিং সৈন্যরা ছুটে এসে ওদের হাতের দড়ি কেটে দিলো। তরোয়াল হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুলতানের সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু দুর্ধর্ষ সৈন্যদের সঙ্গে তারা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলো না। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। সুলতান নিজেও তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিপুণ তরোয়াল চালনায় বেশ কয়েকজন ভাইকিং ঘায়েল হলো। যুদ্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে ভাইকিং সেনাপতি আর তার অনুচরেরা পালিয়ে গেলো।

যুদ্ধ করতে-করতে ফ্রান্সিস হঠাৎ দেখলো, সুলতান রক্তমাখা খোলা তরোয়াল হাতে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে হাসলো। বললো—সুলতান, আমি এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম। সুলতান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে উন্মত্তের মত ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস খুব সহজেই সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে পালটা আক্রমণ করলো। শুরু হলো দুজন নিপুণ যোদ্ধার যুদ্ধ।

যুদ্ধ চললো। দু'জনের নাক দিয়ে ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। দু'জনেই দুজনের দিকে কুটিল চোখে তাকাচ্ছে। আঁচ করে নিচ্ছে, কোন দিক থেকে আক্রমণটা আসতে পারে। একসময় সুলতানের আক্রমণ ঠেকাতে-ঠেকাতে ফ্রান্সিস মঞ্চের সিঁড়িতে পা রেখে ওপরে উঠে গেল। পরক্ষণেই পালটা আক্রমণ করলো। সুলতান এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। হঠাৎ ফ্রান্সিসের পর-পর কয়েকটা তরোয়ালের আঘাত সামলাতে গিয়ে সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গেলেন। গড়িয়ে গেলেন কয়েকটা সিঁড়ির নীচে। ঠিক তখনই চাকাওয়ালা কাঠের পাটাতনটায় করে সোনার ঘণ্টাটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ একটা চাকা গেল ভেঙে। ঘোড়াগুলো টাল সামলালো, কিন্তু সোনার ঘণ্টটা রাজপথে পড়ে ঢং—ঢং শব্দ তুলে কয়েকপাক গড়িয়ে গেল। সুলতান ঠিক তখনই মঞ্চের সিঁড়িটা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু উঠতে আর পারলেন না। সোনার ঘণ্টা গড়িয়ে সুলতানের ওপর গিয়ে পড়ল। সুলতান আর্ত-চীৎকার-করে দু'হাত তুলে সোনার ঘণ্টাটাকে ঠেকাতে গেলেন,

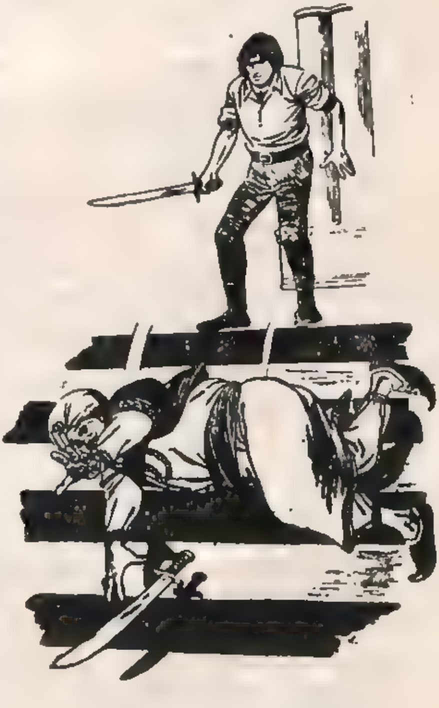

সুলতান পা পিছলে পড়ে গেলেন।

কিন্তু অত ভারী নিরেট সোনার ঘণ্টা — পারবেন কেন! সিঁড়ির সঙ্গে পিষে গেলেন। একটা মর্মান্তিক চিৎকার উঠল। ধারে-কাছের সকলেই ছুটে এলো। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ফ্রান্সিসও বিমূঢ় হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে সুলতানের রক্তাপ্লুত দেহ বারকয়েক নড়ে স্থির হয়ে গেছে। সুলতান মারা গেছেন।

* * *

ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস মঞ্চের দিকে তাকালো দেখলো বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে ভাইকিংদের রাজা। দু'জনেই মিটিমিটি হাসছেন। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। রাজা বললেন — তুমি ভাইকিং জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছো।

— তবু — ফ্রান্সিসের বাবা বললেন, জাহাজ চুরির অপরাধটা ?

রাজা বললেন — হ্যাঁ, শাস্তিটা তো পেতেই হবে, এই রাজত্বের শাসনভার তোমাকে দিলাম।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল — দোহাই, ঐ-টি আমি পারবো না। জাহাজ চালানো, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা, তরোয়াল চালানো, এসব এক জিনিস, আর একটা রাজত্ব চালানো, সে অন্য ব্যাপার। যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি, এই রাজত্বের ভার ফজলকে দিন।

— কে ফজল ?

— আমার বন্ধু। সবদিক থেকে ফজলের মত উপযুক্ত আর কেউ নেই। সে এই দেশেরই মানুষ। যাদের দেশ, তারাই দেশ শাসন করুন, এটাই কি আপনি চান না ?

— নিশ্চয়ই চাই। বেশ! ডাক ফজলকে।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে ফজলকে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেল না। ফ্রান্সিস বললো — ফজল এখানেই আছে কোথাও; আমাকে সময় দিন, ওকে খুঁজে বের করব।

— বেশ, রাজা সম্মত হলেন।

ফ্রান্সিস দেখলো যুদ্ধ থেমে গেছে। সুলতানের সৈনাদের বন্দী করা হচ্ছে। সুলতানের মৃতদেহ ঘিরে শোকার্ত মানুষের ভীড়। ফ্রান্সিসের ভালো লাগছিল না এসব। নাঃ আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। মাথার ওপরে অন্ধকার ঝোড়ো আকাশ, পায়ের কাছে পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ছে, উন্মত্ত বাতাসের বেগ — জীবন তো সেখানেই।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে রাজার কাছে গিয়ে বললো — এবার একটা ভাল জাহাজ দেবেন ?

রাজা সবিস্ময়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন — কেন ?

— আফ্রিকার ওঙ্গালির বাজারে যাব —

— আবার ?

— চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না — ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল — কি বিরাট হীরে! কি চোখ ধাঁধানো আলো ছিটকে পড়ছে!

ফ্রান্সিসের আর বলা হলো না। পেছন থেকে বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল — এখান থেকে আমার সঙ্গে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

— — —

এই গ্রন্থের পরবর্তী ফ্রান্সিস পর্ব — হীরের পাহাড় ৮'০০, মুক্তোর সমুদ্র ১০'০০, তুষারে গুপ্তধন ১০'০০, রুপোর নদী ১০'০০, ফ্রান্সিস সমগ্র ৩০'০০